কুন্তী-কর্ণ-কৃষ্ণা

শ্রীকেদারলাল রায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ—১৩৬৪

মূল্য—দুই টাকা মাত্র

৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে ডি. এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল কর্তৃক মুদ্রিত।

৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,—

সর্বমানবের বন্ধু, প্রগতির প্রবর্ত্তক, স্বীয় জাতীয়তায় অটল, নিষ্পাপ, তেজদীপ্ত হে মহাপুরুষ,—সামান্য নাট্যকারের এই "কুন্তী-কর্ণ-কৃষ্ণা" আপনি গ্রহণ করুন!—আপনার নাম স্মরণ করেও আমি ধন্য!

উদ্দেশ্যে প্রণত:
কেদারলাল রায়।

"মহৎ দেখে কাঁদতে শেখা,
তবেই কাঁদা ধন্য হয়।"

—দ্বিজেন্দ্রলাল

॥ নিবেদন ॥

পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে মাত্র অবলম্বন করে, নাটকের মাধ্যমে মনুষ্য-জীবনের যে অনুভূতিগুলি আমাদের অভিভূত করতে পারে—শুধু সেইগুলিকে অবলম্বন করে এই নাটকের সৃষ্টি। ঐতিহাসিক নাটক যেমন ইতিহাস-মাত্র নয়, তেমনি এই-রকম পৌরাণিক নাটকও পুরাণ-মাত্র নয়। কল্পিত ঘটনার সাহায্যে নাটকীয় মুহূর্ত্তগুলি সৃষ্টি করে, পুরাণোক্ত চরিত্রগুলির মনোবিশ্লেষণই—এই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য। তার ওপর, বর্ত্তমান-যুগোপযোগী করে নাট্যরস পরিবেশন করতে—মাত্র তিনটী দৃশ্যে মহাভারতের প্রধান কাহিনীটিকে উপস্থাপিত করতে হয়েছে। সুতরাং, পৌরাণিক কাহিনীটিকে গতানুগতিকভাবে অনুসরণ না করে—স্বপ্ন ইত্যাদির পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে, কোথাও পৌরাণিক কাহিনীকে বিকৃত করবার প্রয়াস নেই। উদাহরণ স্বরূপ, স্বপ্নে কুন্তীর উদ্দেশ্যে কর্ণের কবচকুণ্ডল-অর্পণ দৃশ্যটি উল্লেখ করা যেতে পারে। এই স্বপ্নের পরও—ইন্দ্র যদি ছদ্মবেশে কর্ণের কবচকুণ্ডল গ্রহণ করেন এবং সেই রকম ঘটনা যদি নাটকে উল্লিখিত না হয়, তাহলে সেরূপ ঘটনার উল্লেখ—নিষ্প্রয়োজনবোধেই বাদ দেওয়া হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

এরপর ভাষা! শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গেও বটে, আর যাত্রাগান, রামায়ণ মহাভারত পাঠ, গীতা ও চণ্ডীপাঠ, কবিগান ইত্যাদির মাধ্যমেও বাঙালীর মন এমন একটা ভাবসম্পদ লাভ করেছে,—যার সত্যিই তুলনা হয় না। তাই বাঙালীর যে-ভাষা প্রতিদিনের সাধারণ ব্যাপারে অপভ্রংশ শব্দে পূর্ণ, তাই-ই আবার মনের গভীর ভাবাবেগের মুহূর্ত্তে—শব্দ-সম্পদে

ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। পাঠক বা দর্শক মনকে, বাস্তব থেকে কল্পনারাজ্যে নিয়ে যেতে--এই ভাষা-বৈচিত্র্যের সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

নাটকখানি রঙ্গালয়ে অভিনয় করতে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। নাটকের গানগুলির জন্যে, গীতিকারের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

নাটকখানি ছাপানোর ব্যাপারে, অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন আমার বন্ধুবর শ্রীপ্রমথেশ রায়। এটা একান্তই হৃদয়ের ব্যাপার।

৩।৭।৫৭
কলিকাতা

ইতি—নিবেদক
কেদারলাল রায়

মিনার্ভা থিয়েটার

প্রথম অভিনয়, ৫ই জুলাই ১৯৫৭, শুক্রবার সন্ধ্যা ৬৷৷ টা।

—চরিত্রলিপি—

শ্রীকৃষ্ণ এবং বক	শ্রীমিহির ভট্টাচার্য্য
ভীষ্ম	„ দেবেন বন্দ্যোপাধ্যায
দ্রোণ	„ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায
শকুনি	„ গোপাল চট্টোপাধ্যায
বিদুর	„ সৌরিণ ঘোষ
কর্ণ	শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায
যুধিষ্ঠির	„ শ্রীপতি চৌধুরী
ভীম	„ বিজয় দত্ত
অর্জ্জুন	„ দীপক মুখোপাধ্যায
নকুল	„ প্রিন্স চৌধুরী
সহদেব	„ নরেন চট্টোপাধ্যায
দুর্য্যোধন	শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
দুঃশাসন	„ জীবেন বসু
বিকর্ণ	„ দ্বিজু ভাওয়াল
দুর্য্যোধনের সভাকবি	„ সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
কুন্তী	নাট্য-সম্রাজ্ঞী শ্রীমতী সরযুবালা দেবী
কৃষ্ণা	শ্রীমতী সীতা দেবী

পরিচালনা, শিল্প-নির্দেশনা ও আলোক সম্পাত

—সতু সেন—

গীতিকার	শ্রীশৈলেন রায়
সুরারোপ	„ পরেশ ধর
সহকারী, শিল্পনির্দেশনায়	শ্রীকল্যাণ গাঙ্গুলী ও „ সুশীল দাস
সহকারী, আলোক সম্পাতে	শ্রীকাশীনাথ পাল
মঞ্চ-ব্যবস্থাপনা	শ্রীমিলনকুমার দত্ত
রূপ-সজ্জা	শ্রীঅমূল্য দাস
শব্দ-সংযোজন	„ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
স্মারক	শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায় ও „ সচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য



কুন্তী-কর্ণ-কৃষ্ণা

প্রথম অঙ্ক

[দুর্য্যোধনের সভাকক্ষ। সভা এইমাত্র সুরু হবে এমনি পরিপাটি করে সাজানো। বামে ও দক্ষিণে দরজা, অপূর্ব্ব মনোহর পর্দ্দায় সুশোভিত। পিছনে জান্‌লা, রং-বেরংএর কাপড় দিয়ে সাজানো। জান্‌লা দিয়ে দেখা যায় হস্তিনাপুরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ ও দুদিকে বৃক্ষের সারি। বহু দূরে আকাশে লাল সূর্য্য। প্রভাত। রথের শব্দ ও শঙ্খধ্বনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাম দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন, দুঃশাসন ও বিকর্ণ।]

বিকর্ণ। ভ্যাথ্ দুঃশাসন! তোর যত সব অশাস্ত্রীয় ব্যাপার! কথায় কথায় গুরুজনকে নিয়ে ঠাট্টা!

দুঃশা। গুরুজনকে বাদ দিয়ে ঠাট্টা হয়! বল্ দেখি—কোন ছেলে-মেয়ে লুকিয়ে বাপকে একবারও মুখ ভেঙচায়নি, কি বক দেখায়নি?

বিকর্ণ। এ সব তোর অশাস্ত্রীয় কথা! সম্পর্কে দাদা হলেও, তোকে দাদা বলে ডাক্‌তে আমার লজ্জা হয়!

দুঃশা। ছোট ভাই বড় হলে ঐ রকমই হয় বিকর্ণ।

বিকর্ণ। তুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও মানিস্‌নে। তুই স্বয়ং অধর্ম্ম!

দুঃশা। আরে মোলো,—তাতে তোর মাথাব্যথা কেন?

বিকর্ণ। তুই আমার ভাই।

দুঃশা। তাই তুই আমার জ্যেঠামশাই হবি! আচ্ছা বল্ তো, ধর্ম্ম কাকে বলে?

বিকর্ণ। যা অধর্ম্ম নয়।

দুঃশা। তবেই হয়েছে! যা অধর্ম্ম নয়, তা আবার আছে নাকি?

বিকর্ণ। ধর্ম্ম নেই?

দুঃশা। না, নেই।

বিকর্ণ। মিথ্যে কথা।

দুঃশা। খবরদার!

বিকর্ণ। [মুখ বিকৃত করে বিকৃত-কণ্ঠে] ও—হ্, তুই আমাকে মারবি নাকি?

দুঃশা। [চপেটাঘাত করে] এই তো মারলাম। কি করবি শুনি?

বিকর্ণ। [সক্ষোভে] তুই আমাকে সত্যি মারলি?

দুঃশা। আরে! জলজ্যান্ত একটা চপেটাঘাত দিলাম, আর তুই বল্ছিস্ তা মিথ্যে?

বিকর্ণ। এটা তোর উচিত হল না। আমি যখন উচিত, তখনই হাত তুলি।

দুঃশা। আমি দরকার হলেই মারি। উচিত অনুচিত পরে ভাবি।

বিকর্ণ। তুই পাষণ্ড, আমাদের বড় ভাই দুর্য্যোধনের মত।

দুঃশা। আর তুই অপোগণ্ড, পাণ্ডবদের বড় ভাই যুধিষ্ঠিরের মত।

বিকর্ণ। আবার গুরুনিন্দে। যা,—তোকে আমি ক্ষমা করলাম।

দুঃশা। ফের! [পুনরায় চপেটাঘাত]

বিকর্ণ। [চমকে] আবার মারলি!

দুঃশা। তুই আবার ক্ষমা কর।

[দক্ষিণ দরজা দিয়ে শকুনি এলেন]

বিকর্ণ। এই যে শকুনি মামা! দ্যাখো তো, দুঃশাসন আমাকে ধরে ধরে কেবলই মারছে। বল্‌ছে—ধর্ম্মাধর্ম্ম নেই, উচিত অনুচিত নেই, দরকার হলেই মারবো ধরবো। এ সব অশাস্ত্রীয় নয়?

শকু। কেন? তোমাদের আচার্য্য দ্রোণ, শাস্ত্র সম্বন্ধে তোমাদের শিক্ষা দেন্‌নি?

বিকর্ণ। [সভয়ে] অ্যাঁ, সে যে শাস্ত্র আর অস্ত্র দুই শিক্ষাই মামা। ওসব আর ওকে বোলোনা। খালি হাতের চড়-চাপড়েই এই! আর যদি গদা কি ধনুর্বাণ ধরে—

দুঃশা। চুপ কর্! [শকুনিকে] তা, হাঁ শকুনি মামা! কদিন ধরে বিদুর কাকাকে খুব ছোটাছুটি করতে দেখছি, ব্যাপার কি বলতো?

শকু। কুরুপাণ্ডবের মধ্যে যুদ্ধ যাতে না হয়,—বিদুর তাই সন্ধির চেষ্টা করছে!

দুঃশা। সন্ধি! বটে! [হাস্য] আমি মামা ঐ সন্দেহই করেছিলাম! শ্রীকৃষ্ণের মতলব তো?

শকু। হ্যাঁ।

দুঃশা। হবেই খেয়েছে! [হাস্য]

বিকর্ণ। যত সব অশাস্ত্রীয় হাসি!

শকু। দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যের ভাগ দেবে না বলে পণ করে বসে আছে। তাই বিদুর দুর্য্যোধনকে বুঝোচ্ছে।

দুঃশা। খুব বুঝোচ্ছে বুঝি? তবেই হয়েছে! [একটু পরে] কিন্তু শুধু বিদুর? না, সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণও?

শকু। এখন তো শুধু বিদুরকেই দেখ্‌লাম।

দুঃশা। তবে, খুব ভাগ্য যে এখনও কৃষ্ণ স্বয়ং দেখা দেন নি! নৈলে সন্ধি সন্ধি করে, যুদ্ধটা এখ্‌খুনি সুরু হয়ে যেত!

বিকর্ণ। তুই কৃষ্ণ নিন্দে করছিস্! জানিস্ শ্রীকৃষ্ণ কে?

দুঃশা। যদি মানুষ হয়, তবে গোয়ালার ছেলে—ঘি-দুধের ব্যবসা নিযে থাকলেই হত। আর যদি ভগবান,—তবে ভগবানের মত হাত-পা গুটিয়ে থাকলেই পারতো। পূজো-অর্চ্চনাও পেতো আর সন্ধি সন্ধি করে শেষে একটা যুদ্ধও পাকিযে উঠতো না।

বিকর্ণ। যত সব অশাস্ত্রীয কথা!

দুঃশা। থাম্! [শকুনিকে] তা হাঁ মামা! তোমাকে কদিন দেখ্‌তে পাইনি কেন?

শকু। আমি শিল্পী ময়দানবের কাছে গিছলাম।

দুঃশা। [অবাক হয়ে] শিল্পী ময়দানব! [শকুনির আপাদমস্তক লক্ষ্য করে] হুঁ! তাড়ি মদ খায়। তবে লোকটা ভাল, বিদুরের মত ভিক্ষে করে না, ভিক্ষে দ্যায।

বিকর্ণ। আবার গুরুনিন্দে!

দুঃশা। ফের! [শকুনিকে] তা হ্যাঁ মামা! ময়দানবের কাছে গিছলে কেন?—লুকিয়ে ধরেছ না কি?

শকু। [সকৌতুকে] কি?—সুরা? মদ?

দুঃশা। উঁ হুঁ হুঁ,—[চুপিচুপি চেঁচিযে] তা-ড়ি।

বিকর্ণ। [মাথা নেড়ে] যত অশাস্ত্রীয় আলাপ!

শকু। তুমি অত্যন্ত স্পষ্ট কথা বলো দুঃশাসন।

দুঃশা। রাগ করলে নাকি?

শকু। না। বরং এইজন্যেই তোমাকে এত ভালবাসি।

দুঃশা। [অবাক হয়ে] ভালবাসো! [পরে হেসে ফেলে] অবাক করলে মামা,—শেষে তুমিও!

শকু। কেন? এতে বিস্ময়ের কি আছে?

দুঃশা। মামা! বাবা অন্ধ, তাই মাও চোখ বেঁধে আছে। বলে, চোখ থাকতেও দেখ্‌বে না। কৌরবদের চক্ষু বল্‌তে কেবল তো তুমি! শেষে তুমিও চোখের মাথা খেলে?—আমাকে ভালবাস কি! আমি পুরুষ গো মামা, পুরুষ!

শকু। [সহাস্যে] তোমাকে সত্যিই ভালবাসি দুঃশাসন।

দুঃশা। খেয়েছে, একেবারে খেয়েছে! শোনো মামা, ভালবাসা কিন্তু খুব ভীষণ ব্যাপার! লোকে যদি ভাল একটু কম কম বাস্‌তো, তবে পৃথিবীতে এত যুদ্ধ দ্বন্দ্ব হত না। তারপর—কর্ণের কথা মনে করো মামা। দেখেছ? তার চেহারাটা কি হয়েছে?

শকু। তা বটে! মহারাজ কর্ণকে, কিছুদিন ধরেই খুব বিমর্ষ আর চিন্তিত দেখ্‌ছি।

দুঃশা। হ্যাঁ, দেখ্‌ছো। সে ঐ ভালবাসাগো মামা, ভালবাসা! দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়, সেই যে মামা,—বিদ্যুৎনয়না, বেণী-আলম্বিতা, রক্তাম্বরা, তন্বী শ্যামা সুন্দরী! কুচযুগলোপরি মণিহার শোভিতা, বঙ্কিম গ্রীবা, গজেন্দ্র গমনা, মধুগন্ধা, মধুকণ্ঠা যুবতী! সেই যে গো মামা, সেই! কর্ণ এখন ভালবেসে, লম্বকর্ণ হয়ে আছে।

বিকর্ণ। কর্ণ চিরদিনই ঐরকম!

দুঃশা। চোপ্‌! [শকুনিকে] তারপর সেই যে সেই ভালবাসা গো! বিম্বাধরা, স্মিতাননা, মনোমোহিনী-মানসীর—মধুকণ্ঠে সঙ্গীতঝঙ্কার,—“কর্ণ, তুমি সূতপুত্র! আমি তোমাকে বরণ করবো না।” ব্যস্! মুখ চুণ, হৃদয়ে আগুন, প্রাণে বিরহ, মনে ঘৃণ।—এখন অহরহ চিন্তা আর অসহ দহন! বুঝেছ?

বিকর্ণ। কেবল কেবল সেই অশাস্ত্রীয় বাক্য!

দুঃশা। আবার শাস্ত্র! আচ্ছা বল্‌তো, কোন্‌টা শাস্ত্র? [অগ্রসর হলেন]

বিকর্ণ। [পিছিয়ে] যেটা শ্রেয়ঃ।

দুঃশা। কোনটা শ্রেয়ঃ? [আবার অগ্রসর হলেন]

বিকর্ণ। [পিছিয়ে প্রায় শকুনির কাছে গিয়ে] যা সত্য।

দুঃশা। হুঁ। যা সত্য, তা হচ্ছে বেঁচে থাকা। গায়ের জোর কর্‌রে বিকর্ণ, গায়ের জোর কর্‌। শাস্ত্রের চেয়ে, অস্ত্র বড়। দেখ্‌ছিস নে, কৌরবরা দলে ভারী তার ওপর শক্তিমান; তাই ধর্ম্ম-অবতার বিদুর পর্য্যন্ত হাঁটাহাঁটি করছে।

বিকর্ণ। তুই ভাবছিস পাণ্ডবেরা দুর্ব্বল? স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাদের পক্ষে।

দুঃশা। ছাই! কেউ কারও পক্ষে নয় রে, সব স্বপক্ষে। শ্রীকৃষ্ণ নিজের তালে আছে। [শকুনিকে] তা হ্যাঁ মামা! তুমি কেন ময়দানবের কাছে গিছলে, তা তো বললে না?

শকু। [চিন্তিতভাবে] বক! ময়দানবকে একটা সাদা বক তৈরী করতে দিয়েছি।

দুঃশা। বক! বুড়ো-বয়সে এ আবার কি সখ মামা?

শকু। আমার নয় দুঃশাসন, সখটা তোমার জ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধনের। সেই বকমূর্ত্তি আজ এই সভাকক্ষে সাজিয়ে রাখা হবে।

দুঃশা। বক!—ওঁ হুঁ, হল না তো! [মাথা নাড়লেন]

বিকর্ণ। মাথা নাড়ছিস যে বড়!

দুঃশা। আরে ওটা থাকলেই নড়ে! তোর নেই, তাই বুঝতে পারছিস নে।—হুঁ! বক! এর মধ্যে একটা রহস্য আছে মামা!

শকু। তা তো জানি নে দুঃশাসন। তবে অঙ্গরাজ কর্ণ নাকি দুর্য্যোধনকে বলেছে,—এই সভাকক্ষে সাদা একটা বক খুব অপূর্ব্ব মানাবে।

দুঃশা। বলেছে? কর্ণ? হুঁ! তবে কর্ণ শুধু প্রেমিক নন, রসিকও খুব! হুঁ, এবার বুঝেছি! সেই যে মামা, সেই যে গল্পটা রটেছে।

কি একটা অরণ্যে, স্বয়ং দেবতা ধর্ম্ম নাকি বক সেজে যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করেছিলেন। সেই বক! জলের ধারে বসে একটি পায়ে দাঁড়িয়ে, আর একটি পা গুটিয়ে রেখে, চক্ষু মুদে ধ্যান করে,— একেবারে মহাযোগী। তবে মধ্যে মধ্যে তাকে ধ্যান ভঙ্গ করতে হয়! আর সে শুধু মৎস্যকুলের উদ্ধারের জন্যে। আহা-হা, -তা বেশ, এ সভাকক্ষেই তাকে মানাবে ভাল।

শকু। [সন্দিগ্ধভাবে] কর্ণ কি তাহলে কাউকে বিদ্রূপ করতে চায় দুঃশাসন?

দুঃশা। [অত্যন্ত ধূর্ত্ততার সঙ্গে] চায় নাকি? কিন্তু কাকে বলতো মামা?

শকু। [সন্দেহের সঙ্গে] যুধিষ্ঠির?

দুঃশা। [সোল্লাসে] মামা! [হেসে] বেশ! যুধিষ্ঠির!—তারপর? মহাত্মা বক আসছেন কখন?

শকু। ময়দানব শীগ্‌গিরই পাঠিয়ে দেবে। বোধ হয় এল বলে!

বিকর্ণ। যত সব অশাস্ত্রীয় কথা!

দুঃশা। ফের্! দাঁড়া তবে—

[বিকর্ণ তাড়া খেয়ে শকুনির পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এই সময় বিদুরের সঙ্গে প্রবেশ করলেন দুর্য্যোধন দক্ষিণ দরজা দিয়ে]

দুঃশা। দাদা দুর্য্যোধন!

দুর্য্যোধন। [প্রফুল্লচিত্তে] শোনো, আমি সন্ধি করছি দুঃশাসন।

বিকর্ণ। অ্যাঁ! [তাড়াতাড়ি ছুটে এসে] খুব ভাল করছো দাদা, শাস্ত্র-সম্মত কাজ। দাও, তোমার পায়ের ধুলো দাও! [পদধূলি গ্রহণ]

দুঃশা। [বিকর্ণকে দেখিয়ে, শকুনিকে চেঁচিয়ে চুপিচুপি] বক।

দুর্য্যো। পাশায় সর্ব্বস্ব হেরে, পাণ্ডবদের বড়ই দুর্দ্দশা হয়েছিল। মা, বাবা, ঠাকুর্দ্দা ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, সকলেই তাদের জন্যে দুঃখিত। আমি যদিও মুখে শক্ত ছিলাম, কিন্তু মনে মনে রাজ্যের অর্দ্ধেক অংশ তাদের ছেড়ে দেব বলেই ঠিক করে রেখেছিলাম! আমি চেয়েছিলাম, তারা শুধু আমার কাছে একবার নতি স্বীকার করুক!

বিকর্ণ। সবাই তাই চায় দাদা। খুব শাস্ত্রসম্মত কথা!

দুর্য্যো। এতদিনে যুধিষ্ঠিরের চৈতন্য হযেছে। পাণ্ডবেরা আমার কাছে এবার দয়া-ভিক্ষা করেছে।

বিদুর। যুধিষ্ঠির তোমার অগ্রজ। তার সম্মান তুমি রেখেছ দুর্য্যোধন! এই সন্ধির কথা শুনে, শ্রীকৃষ্ণও তোমাকে ধন্য ধন্য করবেন।

দুর্য্যো। সত্যি বলতে কি কাকা, যুধিষ্ঠিরের ওপর অভিমান আমার কোনদিন ছিল না। আমার যত রাগ, ভীম আর অর্জ্জুনের ওপর। তাদের আস্ফালন আমার অসহ্য! কিন্তু—মিছিমিছি দেরী করে কি লাভ!—তুমি বরং পাণ্ডবদের এখুনি নিয়ে এসো!

বিদুর। আমি তাদের আগেই খবর পাঠিয়েছি দুর্য্যোধন! তাঁরা এলেন বলে! তবে খবরটা শ্রীকৃষ্ণকেও দিয়ে আসি।

দুঃশা। তিনিও আসবেন নাকি?

বিদুর। সন্ধির তিনিই তো উদ্যোক্তা দুঃশাসন!

দুঃশা। শ্রীকৃষ্ণ! [হাস্য]

দুর্য্যো। তুমি হাসলে কেন দুঃশাসন?

দুঃশা। আমি তোমার দুঃশাসন ভাই। তাই আমার হাসিটাও শাসনের বাইরে! [বিদুরকে] শ্রীকৃষ্ণ তা হ'লে আসছেন? বেশ! [হাস্য]

বিকর্ণ। যত সেই অশাস্ত্রীয় হাসি!

দুর্য্যো। তাহ'লে, আপনি আর বিলম্ব করবেন না বিদুর কাকা।

বিদুর। শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয অপেক্ষা করেই বসে আছেন, খবর পেলেই ছুটে আসবেন!—তোমাকে যে কি বলে আশীর্ব্বাদ করবো, ভেবে পাচ্ছিনে দুর্য্যোধন! তুমি ধর্ম্মে অদ্বিতীয় হও!

[পূর্ব্ব দরজা দিযে প্রস্থান।]

দুর্য্যো। বিদুর কাকা সকলের উপকার করতেই বেঁচে আছেন।

দুঃশা। হ্যাঁ। নৈলে কবে দেহরক্ষা করতেন।

[পূর্ব্ব দরজা দিযে ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রবেশ]

দুর্য্যো। ঠাকুরদা ভীষ্ম, আচার্য্যদেব দ্রোণ, আমি সন্ধি করছি।

দ্রোণ। তাই শুনেই আমরা ছুটে এলাম কুরুরাজ!—যুদ্ধকে ভয আমি করিনে, বরং ভালই বাসি। কিন্তু কুরু-পাণ্ডব,—তাদের প্রত্যেককে আমিই অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছি। তাদের মধ্যে যুদ্ধ হলে, আমার কর্ত্তব্য কি, তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না।

দুঃশা। কেন? দুই পক্ষকেই আশীর্ব্বাদ করতেন, জয়ী হও!

ভীষ্ম। দুর্য্যোধন! তোমাদের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনায় আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গিছলাম! কুরু-পাণ্ডবের সকলকেই আমি কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি।

দুঃশা। ঠাকুর্দ্দা! বুড়ো-বয়সে তুমি একটু ভুল বক্‌তে সুরু করেছো! মানুষ করেছো আমাদের, কিন্তু পাণ্ডবদের করেছো দেবতা। মানুষ আর দেবতার মধ্যে সন্ধি—কখনও হয়নি, হতেও পারে না। [দুর্য্যোধনকে] দাদা, তুমি সন্ধি করছো শুনে—তোমার পরম-বন্ধু কর্ণ কি বললেন?

দুর্য্যো। কর্ণ দুঃখিত হয়েছে। তার মতে, যুধিষ্ঠিরের দয়া-ভিক্ষা, এ সব কৃষ্ণের ছল!

দুঃশা। লোকটা প্রেমিক হলেও পণ্ডিত।

বিকর্ণ। যত সব শাস্ত্র-বহির্ভূত কথা। কর্ণের মতই, সব বিষয়েই সর্ব্বজ্ঞ আর সব তাতেই অসন্তুষ্ট। কথায় কথায় কেবল আমি আর আমি। ঐ বলল— [পাশ দরজা দিয়ে ঢুকলেন কর্ণ]

কর্ণ। দুর্য্যোধন।

বিকর্ণ। [চমকে] আ. মহাবীর কর্ণ।—আসুন আসুন। দাদা কিন্তু পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করছেন মহাবাজ।

কর্ণ। হ্যা। কিন্তু আমি নিষেধ করেছিলাম।

দ্রোণ। সে তো মার দুর্মতি কর্ণ। তুমি কি পৃথিবীর ধ্বংস চাও ?

কর্ণ। পাঁচটা পাণ্ডব নিয়েই পৃথিবী নয়। যুদ্ধ হলে শুধু তারাই ধ্বংস হত। কিন্তু আপনার সঙ্গে তর্ক বৃথা। আপনি ব্রাহ্মণ,—অস্ত্র-নীতিতে পণ্ডিত। কিন্তু ক্ষাত্রনীতি,— আপনার কাছে দুর্ব্বোধ্য।

দ্রোণ। [চঞ্চল হয়ে] ক্ষাত্রনীতি। কর্ণ,— তুমি এই ভীষ্মের চেয়েও ক্ষাত্র ?

কর্ণ। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনও শেষ হয়ে যায়। তাই বার্দ্ধক্য চায় মৃত্যুর সঙ্গে সন্ধি।—ভীষ্ম বৃদ্ধ হয়েছেন।

দ্রোণ। এ তোমার স্পর্দ্ধার কথা। কিন্তু ক্ষাত্রনীতি তোমারও বুঝবার নয়। কর্ণ। তুমি ক্ষাত্র নও, তুমি সূতপুত্র।

কর্ণ। [আহত হয়ে আবেগের সঙ্গে] এ কথা আমি বারংবার অস্বীকার করেছি। জানি না কে আমার সে হতভাগিনী মা, যে কর্ণের মত পুত্রকে পুত্র বলে পরিচয় দেবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। কে সে প্রবঞ্চিতা লাঞ্ছিতা নারী, যার সামান্য ইঙ্গিতে তার সন্তান কর্ণ—হেলায় ত্রিভুবন ধ্বংস করে দিতে পারে, তবু

অপমানিতা, সশঙ্কিতা সে, কর্ণকে সন্তান বলে পরিচয় না দিয়ে আজও নীরব হয়ে আছে !

[কুন্তী দক্ষিণ দরজা দিয়ে প্রবেশ করে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আহ্বান করলেন, —]

কুন্তী। বৎস !

কর্ণ। [সচমকে] কে ? [নির্ণিমেষ নেত্রে কুন্তীর দিকে চেয়ে, পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে] ও—পাণ্ডব-জননী !

কুন্তী। [মনের চাঞ্চল্য সকষ্টে গোপন করে] মহারাজ কর্ণ, আমি দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করছিলাম।

কর্ণ। কিন্তু আমার মনে হ'ল দেবী, তুমি আমাকে সম্বোধন করলে ! মনে হল, যেন আমার দেহের প্রত্যেকটি অণুপরমাণু চমকে উঠলো। আমার শরীরের শিরায় শিরায় বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল ! আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্র, যেন এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো। মনে হল, একটি আহ্বানে বিশ্বের সমস্ত মাতৃত্বের মাধুর্য্য যেন একটি কথা দিয়ে আমাকে স্পর্শ করলো,—আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলাম ! না, করো, করো পাণ্ডব-জননী, তোমার পুত্রতুল্য দুর্য্যোধনকেই তুমি সম্বোধন করো !

[উত্তর দরজা দিয়ে প্রস্থান]

ভীষ্ম। হতভাগ্য সূতপুত্র !—কি ভাবছো কুন্তী ?

কুন্তী। সূত-গৃহে পালিত এই সন্তান—কি এর পরিণতি দেব ?

ভীষ্ম। নাম-গোত্রহীন শিশু, নদীর জলে ভাসতে ভাসতে এসে সূত-গৃহে আশ্রয় পেয়েছিল। হয়তো বা ক্ষাত্র, হয়তো বা ব্রাহ্মণ।

দ্রোণ। হয়তো বা শূদ্র। ভীষ্ম ! কর্ণ কিন্তু সবচেয়ে তোমাকেই অশ্রদ্ধা করে।

ভীষ্ম। তবু সে বীর। আর একটি অদ্বিতীয় অর্জ্জুন! ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্র আমি ধরিনে দ্রোণ, নৈলে এক ঐ কর্ণকে শ্রেষ্ঠ-বর্ণে বরণ করতে আমি সেই ঈশ্বরকেও যুদ্ধে আহ্বান করতাম! কর্ণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান!—কুন্তী, তোমার চক্ষু সজল কেন?

কুন্তী। না দেব! কর্ণের জন্যে নয়! তার হতভাগিনী মায়ের জন্যে আমার অশ্রু!

ভীষ্ম। তুমি যদি কর্ণের জননী হতে, আমি সুখী হতাম কুন্তী! সে যেন আর একটি পাণ্ডব।—একি, তুমি কাঁপছো কেন কুন্তী?

কুন্তী। না। মনে হচ্ছে, সমস্ত পৃথিবী কেঁপে উঠছে। কি একটা ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে চারিদিকে! কার থেকে থেকে ক্রন্দন, পৃথিবীর একটা দিক থেকে দুটো হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে আমার দিকে! —দুটো চোখের দৃষ্টি যেন ব্যগ্র হয়ে আমার দিকে নিষ্পলক চেয়ে আছে! না, এ আমার ভ্রম!—

ভীষ্ম। বুঝেছি। তুমি মা! তোমার মাতৃত্ব আজ কর্ণের দুঃখে হাহাকার করে উঠছে! না, আমাকে উত্তেজিত কোরো না কুন্তী! সংসারের ওপর ক্রুদ্ধ কোরো না আমাকে। ভীষ্মের জিজ্ঞাসা, সে ভয়ানক।

কুন্তী। মার্জ্জনা করবেন দেব!—এ আমার দৌর্ব্বল্য। [দুর্য্যোধনকে] দুর্য্যোধন, আমি তোমার বাপমার কাছ থেকে আসছি। তাঁরা স্বয়ং না এলেও, আমাকে দিয়েছেন তাঁদের হয়ে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবার ভার। বৎস, তুমি আমাদের মুখ-রক্ষা করেছ। আজ তুমি কুরুপাণ্ডবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-স্থান অধিকার করেছ। সহস্র বৎসর ধরে তুমি রাজত্ব করো!

[কর্ণ ফিরে এলেন]

কর্ণ। হ্যাঁ, এ অপূর্ব্ব আশীর্ব্বাদ দেবী! সহস্র বৎসর ধরে, শুধু সন্ধি করো কুরুরাজ! [কুন্তীকে] দেবী, আমি নিজের রাজ্যে ফিরে যাবারই উদ্যোগ করছিলাম। কিন্তু একটা অদ্ভুত প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে। যাবার আগে, তোমার কাছে তার উত্তর চাই!

কুন্তী। [কম্পিত কণ্ঠে] কি তোমার প্রশ্ন কর্ণ?

কর্ণ। কেন জানি না, তোমার লজ্জায় আমার বুকের রক্ত—কেন লাফিয়ে ওঠে; তোমার অপমানে, কেন ক্রোধে আমি আত্মহারা হয়ে উঠি; কেন মনে হয়—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জয় করে আমি তোমার পায়ে এনে দিই। হয়তো, হযতো পৃথিবীর তুমিও সেই একটি মা, যে মাকে আমি না জান্‌লেও—মা বলেই শ্রদ্ধা করি, মা বলেই পূজো করি, মা বলেই ডাকি তাকে!

কুন্তী। [সজলনেত্রে] কর্ণ!

কর্ণ। দুঃখ পেয়েছ পাণ্ডবজননী! [এগিয়ে এসে] কেন? পঞ্চ-পাণ্ডবের জননী। তবে তার কেন এ দুঃখ? [ফিরে দূরে সরে] না! জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র, এই বৃদ্ধ স্থবির ভীষ্ম, পরকাললোভাতুর দ্রোণ,—এঁদের কথা আমি বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু তোমাকে তো ঠিক বুঝ্‌তে পার্লাম না, দেবী। পাণ্ডবেরা কি এতই দুর্ব্বল যে, তাদের মাকে পাঠিয়েছে দুর্য্যোধনের মত এক দাম্ভিককে স্তোকবাক্যে সন্তুষ্ট করতে?

দুঃশা। [ক্রুদ্ধ হয়ে] কর্ণ!

ভীষ্ম। শান্ত হও দুঃশাসন!

কর্ণ। চুপ করে আছ দেবী?

দ্রোণ। এর উত্তর আমি দিচ্ছি কর্ণ! পাণ্ডবেরা দুর্ব্বল নয়! কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ, এ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নীতি!

কর্ণ। তবে প্রকৃতির নিয়ম তুমি জানো না ব্রাহ্মণ! শুধু যুদ্ধেই জীবনের বৃদ্ধি আর মানুষ মাত্রেই—মানুষের ভাই। তাই যুদ্ধ মানেই, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়েরই যুদ্ধ। [কুন্তীকে] কই, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও দেবী!

কুন্তী। না! না কর্ণ! সে উত্তর আমি অন্য একদিন, অন্য এক সময়ে তোমাকে দেব।

কর্ণ। কিন্তু উত্তর তো তোমার নেই। দুর্ব্বল সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে—তুমি বুঝি নিজেই শক্তিহীনা! যদি হতে তুমি কর্ণের জননী, দীনা রমণীর মত দুর্য্যোধনের প্রাসাদে এসে—তার কাছে সন্ধি-ভিক্ষা করতে হত না; কর্ণ বাহুবলে সেই সন্ধি জয় করে এনে, তোমার পায়ের তলে অর্ঘ্য দিত।

কুন্তী। [কম্পিত কণ্ঠে] তুমি আমাকে বারবার ভর্ৎসনা করছো, বৎস। কিন্তু বলো,—বলো কর্ণ, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে—তুমি কোন পক্ষ অবলম্বন করতে?

কর্ণ। যে পক্ষ দুর্ব্বল! যে পক্ষে ঘৃণা, অপমান আর লাঞ্ছনা। যে পক্ষ মানুষের পরিচয়ে, মানুষের লজ্জা মাথায় করে—দেবতার ছলনার বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতো! এই কৌরব পক্ষে,—এই দাম্ভিক হতভাগ্য দুর্য্যোধনের সেনাপতি হয়ে আমি যুদ্ধ করতাম।

কুন্তী। করতে, জানি তুমি তাই করতে কর্ণ। তোমার মাকে যদি জানতে—তবে এই হতভাগিনী, এই জননীর দুঃখ তুমি বুঝতে কর্ণ!

কর্ণ। এত স্নেহময়ী তুমি দেবী! জানি না, কেন তোমার কথা আমার বুদ্ধির চেয়েও সত্যি হয়ে যায়! কেন তোমার কণ্ঠস্বর আমার সমস্ত প্রশ্নকে স্তব্ধ করে দ্যায়! কেন ঐ মূর্ত্তি, ঐ অপূর্ব্ব

জননীর দৃষ্টি—ঐ স্নেহসিক্ত ব্যগ্রতা—এই প্রস্তর-মূর্ত্তিকেও এক মুহূর্ত্তে দ্রবীভূত করে দেয়। শুধু ;— শুধু যদি একবার যুদ্ধ হত দেবী, যারা তোমার স্নেহ নিয়ে ধন্য হয়ে আছে, তাদের চূর্ণ করে দিতে পারতাম ! [দুর্য্যোধনকে] কুরুরাজ ! কর্ণের এই নিষ্ফল আস্ফালন, এ দুঃখ তুমি বুঝবে না।

দুর্য্যো। অঙ্গরাজ ! আমি সন্ধি করবো স্থির করেছি। যুদ্ধের আলোচনা আমি নিষেধ করলাম।

কর্ণ। সে নিষেধ আমি মেনে নিচ্ছি কুরুরাজ। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘৃণা প্রতিনিয়ত তোমাকে নরকে নিক্ষেপ করছে। তোমার মহত্ত্বের কোনও মূল্য নেই। শকুনির সঙ্গে পাশাখেলায় যুধিষ্ঠিরকে হারিয়ে, তুমি তাদের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করেছ। পাণ্ডবদের বারো বৎসরের জন্যে বনবাস আর এক বৎসরের জন্য অজ্ঞাতবাসে পাঠিয়েছ ! জনশ্রুতি, তোমাদের সেই পাশা—মন্ত্রপূত ছিল। পাণ্ডবদের সঙ্গে প্রতারণা করেছ !

দুর্য্যো। [সক্রোধে] মিথ্যে কথা !

কর্ণ। না, লোকে তোমার কথা বিশ্বাস করে না। তারপর, প্রকাশ্যে রাজসভায় রজস্বলা দ্রৌপদীকে ধরে এনে, সকলের সমক্ষে তাকে বিবস্ত্র করে উল্লাস করেছ।

দুর্য্যো। [সক্রোধে] এ সব অসম্ভব কাহিনী !

কর্ণ। কিন্তু লোকে জানে, এ ধ্রুব সত্য ! জতুগৃহে আগুন দিয়ে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারবার ষড়যন্ত্র করেছিলে, বালক অবস্থায় ভীমকে বিষ খাইয়েছিলে। ধর্ম্মদ্বেষী, অত্যাচারী, নিষ্ঠুর দুর্য্যোধন, পাণ্ডবদের ওপর তোমার হিংসা—আজ প্রত্যেকের মুখে গল্পের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে !

দুর্য্যো। এসব অপবাদ কে প্রচার করছে অঙ্গরাজ ?

কর্ণ। যুদ্ধের উদ্দেশ্য জয়,—প্রচারই তার প্রধান অস্ত্র! কিন্তু বিশ্বাস করো দুর্য্যোধন, কর্ণ এই হীন-কাহিনী নিয়ে মাথা ঘামায় না! সে স্মরণ রাখে তার অভেদ্য বর্ম্ম—এই সহজাত কবচ-কুণ্ডল, আর সে শুধু বিশ্বাস করে, তার দিব্য অস্ত্র—যা ব্যর্থ হয় না।

দুর্য্যো। ঠাকুরদা ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, শকুনি মামা, তবে আপনারাই বলুন,—কৌরবের বিরুদ্ধে এ জঘন্য প্রচার কে করছে ?

[ভীষ্ম ও দ্রোণ নীরব]

দুঃশা। [শকুনিকে] মামা, বুঝেছ ?

শকু। [সন্দেহের সঙ্গে] শ্রীকৃষ্ণ ?

দুঃশা। [সোল্লাসে] মামা! জীবনে তুমি এই দুবার সত্যি কথা বললে!

ভীষ্ম। [চম্‌কে] শ্রীকৃষ্ণ!

বিকর্ণ। যত অশাস্ত্রীয় আলাপ! কর্ণের যত উদ্ভট কল্পনা।

দুর্য্যো। [কুন্তীকে] তবে এই যে জনরব, তা সত্যি! আর এর পেছনে শ্রীকৃষ্ণও আছে ?

কুন্তী। কৃষ্ণের লীলা আমি কি জান্‌বো দুর্য্যোধন! তিনি তো আসছেন। তাঁকেই জিজ্ঞাসা কোরো। কিন্তু পাণ্ডবেরা নির্দ্দোষ! তোমাদের অসম্মানে—তাদেরও অসম্মান।

দুর্য্যো। পাণ্ডবদের কথা আমি বলিনি। তারা দোষ করলেও আমার ভাই! আর সন্ধি করবো, এ তো আমি ঠিক করেই ফেলেছি।

[বিদুরসহ যুধিষ্ঠির ইত্যাদি পঞ্চভ্রাতা ও তৎপশ্চাৎ দ্রৌপদী প্রবেশ করলেন উত্তর দরজা দিয়ে]

দুর্য্যো। এই যে তোমরা এসে পড়েছ, যুধিষ্ঠির। আমি স্থির করেছি,

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হবে না। তোমরা বিশ্রাম করো, সভা আরম্ভ হলেই আমি উপস্থিত হবো।

[দক্ষিণ দরজা দিয়ে প্রস্থান]

বিকর্ণ। দাদা চললো অন্ধ বাবার কাছে। যার নিজেরই দৃষ্টি নেই, সে কি পথ দেখাবে বিদুর কাকা ?

বিদু। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণতো আসছেন, বিকর্ণ। [প্রস্থান]

দুঃশা। অঙ্গরাজ কর্ণ, আমার মনে হচ্ছে তুমি সত্যিই পাণ্ডবের হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই যুদ্ধের বহুপূর্ব্বেই, তুমি কৌরবরাজ দুর্য্যোধনকে বধ করলে !

দ্রোণ। শকুনি, সভার আয়োজন শেষ হলে আমাদের সংবাদ দিও। ভীষ্ম ! চলো, আজ আমি তোমার অতিথি।

ভীষ্ম। চলো। যাবার সময় একটা কথা বলে যাই কর্ণ ! তোমার এই শূদ্রোচিত মনোবৃত্তি ভীষ্মের অজ্ঞাত ছিল। মনে রেখো, ভীষ্ম বৃদ্ধ হলেও—ভীষ্ম !

[ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রস্থান]

কর্ণ। আমি প্রতিজ্ঞা কর্লাম—যে যুদ্ধে ঐ বৃদ্ধ অস্ত্র ধারণ করবে, সে যুদ্ধে আমি অস্ত্র গ্রহণ করবো না।

ভীম। ব্যাপার কি হ'ল অর্জ্জুন !

যুধি। চুপ করো ভীম ! [শকুনিকে] সকলকে চঞ্চল দেখছি, এর কারণ কি মামা ?

শকু। সে সব অপ্রিয়-কথা শুনে তুমি মর্ম্মাহত হবে যুধিষ্ঠির ! তবে, দুর্য্যোধন ইচ্ছে করেছে সে সন্ধি করবে।

দুঃশা। ভীম, ইচ্ছে হচ্ছে সন্ধির আগে গদার খেলাটা তোমাকে দেখিয়ে দিই !

ভীম। হুঁ, তুমি দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করেছিলে, আর দুর্য্যোধন ইঙ্গিতে তাকে উরু দেখিয়েছিল!

দুঃশা। সম্পর্কে বৌদি, তাই আমরা তাকে একটু ঠাট্টা করেছিলাম।

ভীম। ইচ্ছে করছে, সন্ধির পূর্ব্বে তোমার বুক চিরে তোমার সব ঠাট্টাটুকু পান করি।

অর্জ্জুন। কর্ণ, তুমি সূতপুত্র! দ্রৌপদীর দিকে তোমার সপ্রেম দৃষ্টির উত্তর আমি তোমাকে দিতাম।

কর্ণ। সব্যসাচী, আমার দিব্য-অস্ত্র তোমার মৃত্যুর জন্যে আমি সংগ্রহ করে রেখেছিলাম। তুমি ভাগ্যবান, তাই সে অস্ত্রের পরিচয় তুমি পেলে না।

অর্জ্জুন। হীন, দাম্ভিক, জন্মপরিচয়-হীন সূতপুত্র!

কর্ণ। [সগর্জ্জনে] অর্জ্জুন!

কুন্তী। একি! সন্ধির কথা কি তোমরা ভুলে যাচ্ছ অর্জ্জুন!—এই শুভক্ষণে তোমাদের পরস্পরের এই হ'ল আলাপ?

দ্রোপদী। শুভক্ষণ! কিন্তু একে কি সত্যিই সন্ধি বলে মা! লজ্জার সঙ্গে, অপমানের সঙ্গে সন্ধি, সে কি মৃত্যু নয়? ওই দুঃশাসন আমাকে উপহাস করেছিল, আমার পরিধেয় বস্ত্রটুকু পর্য্যন্ত কেড়ে নিচ্ছিল!

দুঃশা। [বাধা দিয়ে] সে কি দ্রৌপদী! তোমার সঙ্গে আমার তো ঠাট্টার সম্পর্ক!

দ্রৌপদী। সেই ঠাট্টার উত্তরে, তোমার বুকের রক্তে আমি এই বেণী বাঁধতাম। আর ঐ শূদ্র, সূতপুত্র, আমার পঞ্চ-স্বামী বলে আমাকে বিদ্রূপ করেছিল! স্পর্দ্ধা করে আমাকে বরণ করতে চেয়েছিল। ওই জন্ম-পরিচয়-হীন হীন সূতপুত্র!

কর্ণ। নারী! কেন জানি না, কোন অশুভক্ষণে আমি তোমাকে দেখেছিলাম! তুমিও এক নারী—যে আমাকে চিরদিন মুগ্ধ করে চিরদিন শুধু বিষ ছড়িয়ে আমাকে দগ্ধ করছো। আর সেও আর এক নারী,—যে আমাকে গর্ভে ধারণ করে অবহেলায় নদীর জলে ভাসিয়ে চিরদিনের জন্যে হেয় করে রেখেছে! হায় নারী,—কর্ণের জীবনে শুধু তোমরাই কি থাকবে চির-অভিশাপ হয়ে!

[উত্তর দরজা দিয়ে প্রস্থান]

বিকর্ণ। শাস্ত্র মিথ্যে হবার নয়!

দুঃশা। চুপ কর্! [যুধিষ্ঠিরকে] মহারাজ যুধিষ্ঠির! আপনারা ক্লান্ত। হয় পাশের ঘরে, নয় ইচ্ছা করলে এখানেই বিশ্রাম করতে পারেন। সভার পূর্ব্বে আমরা উপস্থিত হব! [শকুনিকে] কি ভাবছো মামা, চলো?

শকুনি। চলো! আমাকে আবার সভার আয়োজন করতে হবে।

দুঃশা। তা হবে, কিন্তু কই মামা, তোমার সেই—তাই এল না?

শকু। [সবিস্ময়ে] কি তাই?

দুঃশা। সেই যে গো মামা, সেই মহাত্মা, ইয়ে। [হাত দিয়ে দেখালেন,—বক]

শকু। হ্যাঁ ইয়ে।—সে ঠিক আসবে, চলো।

[উত্তর দরজা দিয়ে উভয়ের প্রস্থান]

বিকর্ণ। যত সব অশাস্ত্রীয় কথা!

[দক্ষিণ দরজা দিয়ে প্রস্থান]

কুন্তী। আমি গান্ধারীর কাছে থাকলাম যুধিষ্ঠির। প্রয়োজন হলে, আমাকে সংবাদ দিও!

[দক্ষিণ দরজা দিয়ে প্রস্থান]

[দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবেরা বিস্তৃত-শয্যার ওপর বসলেন]

যুধি। মধ্যম! আমরা কয়েক ক্রোশ পথ হেঁটেছি। বিদুর কাকা যদি রথ না পাঠাতো, তবে এই চার ক্রোশও আমাদের হাঁটতে হত। আমরা এখেনেই বিশ্রাম করি। [শয়ন]

ভীম। হুঁ! অর্জ্জুন! তুমি ক্লান্ত হয়েছ? [শয়ন]

অর্জ্জুন। না—[শয়ন]

নকুল। আমি এখনও দশ ক্রোশ হাঁটতে পারি। [শয়ন] সহদেব, তুমি?

সহ। আমি বিশ ক্রোশ। [শয়ন] দ্রৌপদী, তুমি হচ্ছ পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী। এই সামান্য পরিশ্রমে নিশ্চয়ই ক্লান্ত হওনি!

দ্রৌপদী। [দাঁড়িয়ে] হ্যাঁ, বীর পঞ্চপাণ্ডব তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে নাও, আর তোমাদের স্ত্রী এই পাঞ্চালী শুধু একা জেগে থাক্। [কিছু দূরে গিয়ে শয়ন। সকলের নিদ্রা। দৃশ্যে উত্তর দিক থেকে গলা বাড়িয়ে দেখা দিল একটি বিরাট বকমূর্ত্তি। এগিয়ে এলেন শকুনি ও একজন বাহক।]

শকু। আচ্ছা, এখেনেই থাক! পাণ্ডবেরা দেখছি অকাতরে ঘুমুচ্ছে। চলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

হঠাৎ যেন কয়েকটা বীণার তারের ওপর কে যেন এক সঙ্গে আঘাত করল। বকের দেহ থেকে ধোঁয়ার মত যেন অজস্র কুহেলিকা বেরুতে লাগল। কোথায় যেন সুরু হল অপূর্ব্ব বীণাধ্বনি। সমস্ত দৃশ্য যেন কুহেলিকায় ছেয়ে, শেষে অন্ধকার হয়ে গেল! বীণাধ্বনি আস্তে আস্তে থেমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে

কুহেলিকাও যেন ধীরে ধীরে কেটে গেল। দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হয়েছে। দৃশ্যে বকমূর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে দেখা যাচ্ছে। নীলাভ আলো। বন ও বনের মধ্যে ছোট একটি নদী। আবার কে যেন এক সঙ্গে কতকগুলো বীণার তারে আঘাত করলো, দৃশ্য সম্পূর্ণভাবে আলোকিত হল। উঠে বসলেন এক-সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী।]

যুধি। মধ্যম, আমরা কি স্বপ্ন দেখছিলাম !

ভীম। ওঃ—হঠাৎ যেন আকণ্ঠ-পিপাসায় আমার গলা পর্য্যন্ত শুখিয়ে যাচ্ছে। [অর্জ্জুনকে] অর্জ্জুন !

অর্জ্জুন। দীর্ঘ তপস্যার পর যেন আমার ধ্যান ভঙ্গ হল। উঃ—মনে হচ্ছে কতদিন ধরে আমি একফোঁটা জলও পাইনি। [নকুল-সহদেবকে] তোমরা ?

নকুল। অর্জ্জুন ! তৃষ্ণায় আমি উন্মাদ হয়ে উঠেছি—[শয়ন]

সহদেব। জল, অর্জ্জুন ! এক ফোঁটা জল ! অসহ্য পিপাসা ! উঃ— দ্রৌপদী ! [শয়ন]

দ্রৌপদী। বীর পাণ্ডব,—তোমরা সামান্য তৃষ্ণাও সহ্য করতে পারো না ? [যুধিষ্ঠিরকে] ধর্ম্মরাজ ! তুমি না আত্মজয়ী ! তৃষ্ণাকে জয় করতে পারছো না ?

যুধি। দ্রৌপদী, আমরা যখন মৃত্যুমুখে—তখন বিদ্রূপ করছো তুমি !

দ্রৌপদী। না স্বামিন্ ! ভেবেছিলাম শুধু রমণী বলেই তৃষ্ণায় এত কাতর আমি। এখন বুঝলাম,—বীর-দুর্ব্বল, ধার্ম্মিক-অধার্ম্মিক, পুরুষ-নারী, কেউ প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করতে পারে না। ওঃ, একি তৃষ্ণা ! [অর্জ্জুকে] অর্জ্জুন ! পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী হয়ে আমি কি তৃষ্ণায় মরে যাব ?

অর্জ্জুন। সঙ্গে গাণ্ডীব থাকলে, পৃথিবীর বুক থেকে তার সমস্ত বারি-ধারা আমি শোষণ করে আনতাম! কিন্তু—না,—সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে যাচ্ছে। উঃ কি পিপাসা! [শয়ন]

যুধি। [ব্যগ্র হয়ে] অর্জ্জুন, গাণ্ডীবি—

ভীম। জ্যেষ্ঠ! মনে হচ্ছে, রাজ্যের চেযে জলের প্রয়োজনই বেশী। —ওঃ—[শয়নোদ্যোগ]

যুধি। [ভীমকে ঠেলা দিযে] উঃ! না, ঐ ত্যাখো বীর,—ঐ নদী! যাও, —জল নিযে এসো ভীম। জল এনে আমাদের বাঁচাও!

ভীম। অ্যাঁ! জলই তো! কিন্তু জ্যেষ্ঠ, আমরা কি দুর্য্যোধনের প্রাসাদে ছিলাম না?

যুধি। আগে জল, তাবপর বিচার বুদ্ধির কথা। যাও। [শযন] নকুল, সহদেব, অর্জ্জুন, তোমরাও যাও। যাও, যাও তোমরা—

[ভীমাদি অগ্রসর হয়ে বকের নিকটবর্ত্তী হলেন]

বক। তিষ্ঠ!

ভীম। [চমকে] কে?

বক। আমি বক!—ঐ নদীতে প্রচুর জল আছে। কিন্তু ঐ জল স্পর্শ করবার আগে, আমার পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ভীম। জল খেয়ে তারপর পরীক্ষা দেব পক্ষীবর! [অগ্রসর]

বক। তিষ্ঠ!

ভীম। [দাঁড়িয়ে] হুঁ! মহাশয় বক, আপনার মতলব কি?

বক। এই বন এখন আমার মন্ত্রপূত, কারও শক্তি নেই যে আমার আদেশ এখেনে অমান্য করে! বলো, সুখী কে?

ভীম। এ তোমার অদ্ভুত সখ!

বক। উত্তর দাও ভীম। সুখী কে?

ভীম। যার আছে প্রচুর ক্ষিধে আর অফুরন্ত খাবার।

বক। বল অর্জ্জুন, শ্রেষ্ঠ বন্ধু কে ?

অর্জ্জুন। উত্তম রথ ও সারথি।

বক। [তৎক্ষণাৎ] নকুল, তুমি বলো কি শ্রেষ্ঠ সম্পদ ?

নকুল। রূপ আর সুন্দরী নারী—

বক। [তৎক্ষণাৎ] তুমি বল সহদেব, আশ্চর্য্য কি ?

সহদেব। মূর্খের পাণ্ডিত্যাভিমান।

বক। যাও, তোমরা জলস্পর্শ করে প্রাণত্যাগ করো !

সহ। তবে তুমিও আশ্চর্য্য বক।

বক। [কঠোর স্বরে] যা-ও !

[ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেবের প্রস্থান।
আবার সেই শব্দ। এবার উঠলেন দ্রৌপদী।]

দ্রৌপদী। উঃ, একি তৃষ্ণা ! অর্জ্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব ! এ কি, এরা কেউ নেই ! [যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে] ধর্ম্মরাজ ! উঠুন ! তৃষ্ণায় যে আমি অজ্ঞান হযে যাচ্ছি প্রভু। দিন, আমাকে জল এনে দিন।

যুধি। আমি অক্ষম দ্রৌপদী। সমস্ত শরীর আমার অসাড় ! চার ভাই জল আনতে গিয়েছে। তুমি ছ্যাখো ! তারা ফিরলো না কেন ?

দ্রৌপদী। আমি দেখবো ! ধর্ম্মরাজ, পুরুষ হয়ে একি কথা আপনার !

যুধি। পুরুষের আর স্ত্রীলোকের তৃষ্ণা ভিন্ন নয় দ্রৌপদী। পিপাসায় আমি চোখেও দেখতে পাচ্ছিনে। পার যদি, জল এনে আমারও প্রাণ বাঁচাও কৃষ্ণা ! উঃ,—ঐ দেখ নদী—

দ্রৌপদী। এই পৌরুষত্ব ! এই পাণ্ডবের শৌর্য্য ! ধিক, শত ধিক পাণ্ডবদের ! [বকের নিকটবর্ত্তী হলেন]

বক। ধিক, শত ধিক পাণ্ডবদের!

দ্রৌপদী। কে?

বক। ভয় পেও না দ্রৌপদী! আমি বক। তোমার চারজন স্বামী আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পে'র প্রাণ হারিয়েছে। যদি তুমিও অপারগ হও, তবে তোমারও মৃত্যু হবে।

দ্রৌপদী। পক্ষীবর! ভীমার্জ্জুন যা পারেনি, সামান্য রমণী হয়ে আমি তা পারবো?

বক। রমণী যখন নিজেকে সামান্য বলে, তখন সে অসামান্য চাতুরী প্রকাশ করে। বলো, সুখী কে?

দ্রৌপদী। [সভয়ে] কে সুখী?

বক। হ্যাঁ, বলো কে সুখী?

দ্রৌপদী। [সভয়ে] যার একটিমাত্র স্বামী, কিম্বা স্বামী নেই—

বক। [তৎক্ষণাৎ] শ্রেষ্ঠ পথ কি?

দ্রৌপদী। [ভয়ে ভয়ে] ক্রন্দন। নৈলে—

বক। [বাধা দিয়ে] শ্রেষ্ঠ বন্ধু?

দ্রৌপদী। [একটু সাহসের সঙ্গে] রূপ ও যৌবন! নারীর ঐ—

বক। [বাধা দিয়ে] শ্রেষ্ঠ সম্পদ কি?

দ্রৌপদী। [আরও সাহসে] স্বাস্থ্য। আর যদি—

বক। [বাধা দিয়ে] পৃথিবীতে সবচেয়ে আশ্চর্য্য কি?

দ্রৌপদী। [সোৎসাহে] পুরুষের হিংসে। আর তারা—

বক। [বাধা দিয়ে] যাও দ্রৌপদী, জলস্পর্শ করে প্রাণত্যাগ করো।

দ্রৌপদী। [সক্রন্দনে] বিহঙ্গম, আমি আপনার স্তব করছি। আমি —আমি সামান্য নারী। আমি—

বক। [বাধা দিয়ে] যাও!

[দ্রৌপদী চলে গেলেন। আবার সেই অদ্ভুত শব্দ। উঠে বসলেন যুধিষ্ঠির। তারপর সকষ্টে দাঁড়ালেন। চারিদিকে চেয়ে, টল্‌তে টল্‌তে অগ্রসর হযে বকের সম্মুখীন হলেন।]

যুধিষ্ঠির। কে আপনি পক্ষী ?

বক। আমি বকরূপী যক্ষ ! মাযা দিযে আমি তোমাদের নিদ্রা আর তৃষ্ণার সৃষ্টি করেছি। তোমার সমস্ত ভাই আর দ্রৌপদী আমার অভিশাপে প্রাণত্যাগ কবেছে।

যুধি। কি তাদের অপরাধ দেব ?

বক। তারা আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। ঐ সম্মুখে নদী। তুমি তৃষ্ণার্ত্ত। পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিযে তুমি জল পান করতে পাব।

যুধি। আপনাব আদেশ আমি পালন করছি। কিন্তু আমার ভাইদের আর দ্রৌপদীব কি হবে দেব ? কি করলে, আমি তাদের বাঁচাতে পারবো ?

বক। তারা একেবারেই অপদার্থ যুধিষ্ঠির। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দাও ! বলো, -সুখী কে ?

যুধি। যিনি অঋণী, নিজ আবাস-গৃহে স্বোপার্জ্জিত অন্ন গ্রহণ করেন।

বক। শ্রেষ্ঠ পথ কি ?

যুধি। মহাজনেরা যে পথে গমন কবেন।

বক। শ্রেষ্ঠ বন্ধু কে ?

যুধি। বিপদে দুঃখে শোকেও যিনি সুহৃদ্‌।

বক। শ্রেষ্ঠ সম্পদ ?

যুধি। বিদ্যাযুক্ত জ্ঞান,—যা কেউ অপহরণ করতে পারে না, অথচ দানে বৃদ্ধি পায়।

বক। পৃথিবীতে সবচেয়ে আশ্চর্য্য কি?

যুধি। জন্মে মৃত্যুই মানুষের সুনিশ্চিত ভাগ্য। তবু মানুষ মৃত্যুর কথা ভুলে, নিদ্রা ও বিলাসে দিনপাত করে;—এই আশ্চর্য্য।

বক। যুধিষ্ঠির, আমার প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর তুমি দিয়েছ। এখন জলপান করে তুমি সুস্থ হতে পার। কিন্তু যদি তোমার ভাইদের আর পাঞ্চালীকে বাঁচাতে চাও, তবে আমার আর একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

যুধি। বলুন!

বক। মনে রেখো, উত্তর আমার মনোমত না হলে তোমার মৃত্যু।

যুধি। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো দেব। বলুন!

বক। কিন্তু কি প্রয়োজন যুধিষ্ঠির? আমি অর্জ্জুনকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি, তুমি জল পান করে সুস্থ হয়ে রাজত্ব অর্জ্জন করো।

যুধি। না দেব। আপনি প্রশ্ন করুন!

বক। বলো, মানুষের আশা কি, ধর্ম্ম কি, আর কি কর্ত্তব্য?

যুধি। মানুষের আশা প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্ম আত্মরক্ষা, কর্ত্তব্য যুদ্ধ। [স্তম্ভিত হয়ে] যুদ্ধ!!!

বক। হ্যাঁ যুদ্ধ! যাও যুধিষ্ঠির, জল পান করে তোমার ভাইদের আর দ্রৌপদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। তারা সকলেই বেঁচে উঠ্‌বে। যাও।

যুধি। যুদ্ধ! যুদ্ধ!!

[যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান। সেই অদ্ভুত শব্দ। বকের দেহ থেকে ধোঁয়ার আবির্ভাব। বীণার ধ্বনি। পরে রাজ-সভার দৃশ্যের পুনরাবির্ভাব। কিন্তু কক্ষ জনশূন্য। উত্তর দরজা দিয়ে শকুনি ও দক্ষিণ দরজা দিয়ে দুঃশাসন প্রবেশ করলেন।]

শকু। কি দেখছো দুঃশাসন? বক?

দুঃশা। হ্যাঁ।

শকু। যুধিষ্ঠির, ভীম,—এঁরা সব কোথায়?

দুঃশা। পাশের ঘরে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। কিন্তু সভার আর কত দেরী মামা?

শকু। পাণ্ডবদের ডেকে দাও। এখুনি শঙ্খধ্বনি করে সভা বসবে।

দুঃশা। শঙ্খধ্বনি করে?

শকু। হ্যাঁ, সভায় শুধু পাণ্ডবেরা আর শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত থাকলেই যথেষ্ট। যাও, ওদের সংবাদ দাও দুঃশাসন। আমি ভীষ্ম-দ্রোণকেও খবর দিই।

[উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান। একটু পরেই
দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডবের প্রবেশ]

যুধি। আশা—প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্ম—আত্মরক্ষা, কর্ত্তব্য—যুদ্ধ!—হ্যাঁ—যুদ্ধ! যুদ্ধ!

ভীম। জ্যেষ্ঠ, এ নিশ্চয়ই স্বপ্ন!

সহ। সেই স্বপ্ন আমরা এক সঙ্গে দেখলুম!

দ্রৌপদী। [বকের দিকে নির্দ্দেশ করে] ঐ দেখুন ধর্ম্মরাজ!

ভীম। এ বিদ্রূপ!

অর্জ্জুন। সন্ধির নাম করে ডেকে এনে এ আমাদের অপমান করা!

যুধি। উত্তেজিত হোয়ো না অর্জ্জুন! একদিন বনবাসে যা ঘটেছিল, আমরা তা নিয়ে একাধিকবার আলোচনা করেছি। এ-স্বপ্ন তারই প্রত্যক্ষ ফল!

দ্রৌপদী। স্বপ্ন! কিন্তু—ঐ,—ঐ—বক?

ভীম। এ অপমান অসহ্য! এর উচিত উত্তর হচ্ছে যুদ্ধ!

যুধি। যুদ্ধ! হ্যাঁ যুদ্ধ!—না, না,— আমি সন্ধিপ্রার্থী ভীম।

দ্রৌপদী। সন্ধি আর সন্ধি! কৌরবেরা পদে পদে তোমাদের অপমান করবে—আর তোমরা সহ্য করে বলবে,—সে তোমাদের মহত্ত্ব! কিন্তু আমি? কার শক্তিকে বিশ্বাস করে, আমি নির্ভর হবো? কে রক্ষা করবে আমার ধর্ম্ম—আমার রমণীত্ব? উত্তর দাও ধর্ম্মরাজ! বলো! বলো, পাঞ্চালী তোমাদের দাসী—না সহধর্ম্মিনী?

ভীম। অর্জ্জুন! ইচ্ছে করছে, ঐ বকটার মুণ্ড আমি ছিঁড়ে ফেলি।

অর্জ্জুন। আর আমার ইচ্ছে হচ্ছে—কৌরবের এই প্রাসাদ ভূমিসাৎ করে দিয়ে যাই।

দ্রৌপদী। আর আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানো ধনঞ্জয়!

অর্জ্জুন। বীর নারী তুমি, যাজ্ঞসেনী। নিশ্চয়ই তোমারও অস্ত্রধারণ করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

দ্রৌপদী। না। আমার ইচ্ছে হচ্ছে, আমি চীৎকার করে কাঁদি।—শুধু মানুষকে গর্ভে ধারণ করতেই যদি নারীর সৃষ্টি—তবে বিধাতার ব্যর্থ-সৃষ্টি এই নারী। তাই নিজের লজ্জায়, অপমানে, দুঃখে, শুধু অসহায়ের মত চীৎকার করে কাঁদি।

[উত্তর দরজা দিয়া বিকর্ণের প্রবেশ]

বিকর্ণ। অ্যাঁ, কাঁদি! এই কৌরব প্রাসাদে? না পাঞ্চালী, সে অত্যন্ত অশাস্ত্রীয় ব্যাপার! [রথের শব্দ] ঐ শ্রীকৃষ্ণ এলেন।

দ্রৌপদী। শ্রীকৃষ্ণ? [একটু দূরে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন]

যুধি। কৃষ্ণ! [অন্যদিকে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন]।

ভীম। অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ! [অর্জ্জুন ও ভীম অন্যদিকে গিয়ে দাঁড়ালেন]

সহদেব। শুনেছ নকুল!

নকুল। হ্যাঁ, শ্রীকৃষ্ণ!

[নকুল ও সহদেব, যুধিষ্ঠির ভীম এঁদের দিকে চেয়ে—পরে পরস্পর পরস্পরের দিকে চাইলেন। শেষে উভয়ে বিপরীত দিকে গিয়ে দাঁড়ালেন। ছিন্নভিন্ন পাণ্ডবদল। শ্রীকৃষ্ণ ঘরে ঢুকলেন]

কৃষ্ণ। মহারাজ যুধিষ্ঠির! আমার এত পরিশ্রম এবার সার্থক হল। দুর্যোধন সন্ধি করতে প্রস্তুত। এবার আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম!—ওকি ভীম! তুমি অন্যদিকে মুখ ফেরাচ্ছ কেন?

ভীম। [মুখ না ফিরিয়ে] না।

কৃষ্ণ। অর্জ্জুন! তুমি নতমুখে কেন?

অর্জ্জুন। [অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে] না।

কৃষ্ণ। নকুল-সহদেব?

নকুল। উঁ-হুঁ

সহদেব। না।

কৃষ্ণ। তাই তো! তবে? [সবাই নীরব] পাঞ্চালী?

দ্রৌপদী। [মুখ ফিরিয়ে] কিছু নয়।

কৃষ্ণ। [সকলের দিকে চেয়ে পরে] সন্ধি কি তোমরা পছন্দ করছো না? [নীরব] যুধিষ্ঠির?

যুধি। [বিষণ্নভাবে] সন্ধিই জনার্দ্দনের অভিপ্রায়।

কৃষ্ণ। আমার!—কিন্তু তোমরা এত বিষণ্ন কেন?

[সহসা যেন বকটিকে দেখতে পেয়ে]

ওকি!—ও,—ঐ বক?

বিকর্ণ। দাদার যত শাস্ত্রবহির্ভূত কাজ!　　[প্রস্থান]

কৃষ্ণ। ছি-ছি-ছি, কৌরবদের হীনতা কিছুতেই গেল না। একদিকে সন্ধির আয়োজন আর একদিকে যুধিষ্ঠিরকে অপমান!

দ্রৌপদী। সন্ধির আয়োজন তো কৌরবদের নয় কৃষ্ণ, সন্ধির জন্যে ব্যস্ততা পাণ্ডবদের।

কৃষ্ণ। তাই যুধিষ্ঠিরকে বিদ্রূপ ?

অর্জ্জুন। [হঠাৎ এগিয়ে এসে] সখা, বলো এর সমুচিত উত্তর দিই !

কৃষ্ণ। সে উত্তরের অর্থ যে, যুদ্ধ সব্যসাচী।

ভীম। তবে যুদ্ধই হোক্ !

কৃষ্ণ। যুদ্ধ মানে কৌরব ধ্বংস। কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ –? কোটী-কোটী নিরাহ মানুষ ? না। দুর্য্যোধন অধার্ম্মিক--তাই কৃপার পাত্র !

দ্রৌপদী। এ আবার কি কথা জনার্দ্দন ! কৃপাপ্রার্থী হযেই তো পাণ্ডবেরা সন্ধি ভিক্ষা করছে।

কৃষ্ণ। দাম্ভিক দুর্য্যোধন বুঝি এই কথা বলছে ?

দ্রৌপদী। বল্‌ছে ! আমি কল্পনায় তার মুখে স্পষ্ট বিদ্রূপের হাসি দেখছি। সে হাসির অর্থ,—কি যাজ্ঞসেনী ! তোমাকে অপমান করেছি, লাঞ্ছিত করেছি, তোমার কেশাকর্ষণ করে--তোমাকে বিবস্ত্র কর্বার চেষ্টা করেছি। এবার ? এবার তোমার ধর্ম্ম, তোমার নারীত্ব ? সব আমাদের দয়ার ওপর নির্ভর করছে। পঞ্চস্বামী তোমার,—ষষ্ঠস্বামী---ঐ কর্ণকে বরণ করো !

অর্জ্জুন। আমি গাণ্ডীব ধারণ করবো শ্রীকৃষ্ণ। কৌরবশুদ্ধ এই সসাগরা পৃথিবী, আমি ধ্বংস করবো।—যুদ্ধ, আমি যুদ্ধ চাই যদুপতি !

ভীম। ঐ বক ! [অগ্রসর হ'য়ে] ওর মুণ্ডটা আমি ছিঁড়ে ফেলবো।

যুধি। শান্ত হও ভীম !

ভীম। না—না! এ আমি সহ্য করবো না!

[দুর্য্যোধনের প্রবেশ দক্ষিণ দরজা দিয়ে]

দুর্য্যো। কি সহ্য করবে না ভীম?

কৃষ্ণ। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ভীম কাতর হয়েছে কুরুরাজ।

ভীম। মিথ্যে কথা!

কৃষ্ণ। আহ্—সবাই জানে তুমি অত্যন্ত লোভী। এতে লজ্জার কি আছে। [দুর্য্যোধনকে] কুরুরাজ, সন্ধিপত্র প্রস্তুত করেছ?

দুর্য্যো। [একখানি তালপত্র দেখিয়ে] হ্যাঁ! সমস্ত রাজ্যটাকে আমি পূর্ব্ব-পশ্চিমে ভাগ করেছি। পাণ্ডবেরা যে-কোনও অংশ গ্রহণ করতে পারে।

যুধি। যে অংশ নিকৃষ্ট, তাই আমাকে দিও সুযোধন!

দুর্য্যো। তা হবে না যুধিষ্ঠির। নিকৃষ্ট-অংশ সবলের প্রাপ্য, আমি গ্রহণ করবো।

যুধি। কিন্তু ধর্ম্মমতে আমারও একটা কর্ত্তব্য আছে সুযোধন। তুমি আমার স্নেহভাজন। উৎকৃষ্ট অংশই তোমাকে দেব।

দুর্য্যো। দেবার অধিকার আমার, তোমার নয় যুধিষ্ঠির। আমি তোমাকে উৎকৃষ্ট অংশই দেব।

যুধি। সে তোমার মহত্ত্ব ভাই! কিন্তু আমি জ্যেষ্ঠ, আমি নিকৃষ্ট অংশই নেব।

দুর্য্যো। এ তোমার অন্যায় স্পর্দ্ধা! নিকৃষ্ট অংশ আমি নেব যুধিষ্ঠির। নৈলে, বিন্দু-পরিমাণ ভূমিও তুমি পাবে না।

যুধি। কিন্তু—

দুর্য্যো। কিন্তু নয়। উৎকৃষ্ট অংশই আমি দান করবো।

[উত্তরদিক দিয়ে কর্ণের প্রবেশ]

কর্ণ। অপূর্ব্ব মহত্ত্ব উভয়ের মহারাজ! যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মহত্ত্বের প্রতিযোগিতায় এসে দাঁড়িয়েছে। দুর্য্যোধন, দুর্ব্বল পাণ্ডবদের তুমি সমস্ত রাজ্য দান করে দাও; কর্ণ স্বর্গ জয় করে তোমাকে ইন্দ্রত্ব দিতে পারবে।

ভীম। কর্ণের শক্তি বাক্যে, আর পাণ্ডবের শক্তি—তাদের কার্য্যে।

কর্ণ। পাণ্ডবের শক্তি ভিক্ষায়, আর কর্ণের শক্তি দানে। যদি কেউ আমার এই প্রাণ,—এই কবচ-কুণ্ডল ভিক্ষা চায়, নিজের দেহ থেকে কেটে নিয়ে আমি তাও দান করবো।

কৃষ্ণ। এ কি প্রতিজ্ঞা করে ফেল্‌লে অঙ্গরাজ! ঐ কবচ-কুণ্ডলের জোরেই তুমি অজেয়।

কর্ণ। জনার্দ্দন! কর্ণ যেমন জয় করে, তেম্নি সে জয় দানও করে। রাজ্যলোভে পাণ্ডবদের মত, সে দরজায় দরজায় পরাজয় ভিক্ষা করে বেড়ায় না।

অর্জ্জুন। এ অসহ্য অপমান! তবে শোনো সূতপুত্র! যদি যুদ্ধ হয়, প্রতিজ্ঞা করছি—আমি তোমাকে বধ করবো।

কর্ণ। সে প্রতিজ্ঞা যদি রক্ষা করতে চাও অর্জ্জুন, আমার এই কবচ-কুণ্ডল আর আমার দিব্য-অস্ত্র আমার কাছ থেকে ভিক্ষা করে চেয়ে নিও। নৈলে, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যদি যুদ্ধ হয়, হয় কর্ণ নয় অর্জ্জুন—শুধু একজন বেঁচে থাকবে। [দুর্য্যোধনকে] আমি চল্‌লাম কুরুরাজ। সমস্ত রাজ্য তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে দান করে দাও! [প্রস্থানোদ্যত ও হঠাৎ বক মূর্ত্তিটি লক্ষ্য করে] ও কি! ও,—সেই বক্।—হা-হা-হা! [যুধিষ্ঠিরকে] মহারাজ যুধিষ্ঠির, ঐ তোমাদের

ধর্ম্ম! বক্!—হা-হা-হা! [হঠাৎ হাসি থেমে গেল, নিমেষে পঞ্চপাণ্ডবকে দেখে নিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে] কাপুরুষ!

[কর্ণ প্রস্থান করলেন।]

ভীম। কাপুরুষ! [হঠাৎ ছুটে গিয়ে বকের মুণ্ডুশুদ্ধ গলাটা ধরে] অর্জুন! এর জন্যে যদি যুদ্ধ হয়, তবে হোক যুদ্ধ। [বকের মাথাটা ছিঁড়ে দূরে নিক্ষেপ]

অর্জুন। [উত্তেজিতভাবে] হ্যাঁ যুদ্ধ! হোক্ যুদ্ধ, যুদ্ধই হোক মধ্যম।

দুর্য্যো। [কম্পিত কলেবরে] পাণ্ডবদের এতদূর স্পর্দ্ধা! বেশ, তবে শোনো কৃষ্ণ, সন্ধির প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল আমাকে অপমান করা। আমি যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।

[দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধভাবে চলে গেলেন। সভা আরম্ভ হওয়ার নির্দেশে হঠ্যাৎ শঙ্খধ্বনি হল।]

শ্রীকৃষ্ণ। এ কর্ণের দুর্বুদ্ধি! মনে পড়ে—সভায় বক রাখার কথা, একবার আমি তাকে পরিহাস ছলে বলেছিলাম। যাও যুধিষ্ঠির, তোমরা সকলের কাছে বিদায় নিয়ে এসো। [প্রস্থানোদ্যত ও তদগতভাবে] হাঁ্যা, মানুষের আশা প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্ম আত্মরক্ষা, আর কর্ত্তব্য—[তাঁর চোখের সম্মুখে চারিদিকে যুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্য, এক মুহূর্ত্তের জন্যে ব্যাকুল]

যুধিষ্ঠির। [সবিস্ময়ে অগ্রসর হয়ে তৎক্ষণাৎ] জনার্দন!

শ্রীকৃষ্ণ। [দৃষ্টি চঞ্চল] হাঁ্যা, কর্ত্তব্য যুদ্ধ।

[শ্রীকৃষ্ণ চলে গেলেন। বিস্ময়ে অভিভূত তখন পঞ্চপাণ্ডব ও কৃষ্ণা। বাইরে, হঠাৎ যুদ্ধের সূচনায় দামামা বেজে উঠ্‌লো।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[কর্ণের শিবিরস্থ একটি কক্ষ। উত্তরে, দক্ষিণে, ও পশ্চাতে কিঞ্চিৎ উত্তরাংশে একটি দরজা, এবং পশ্চাতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণাংশে একটি জানলা। উত্তর দিকের দরজাটি ভেজানো। অন্যান্য দরজা জানলাগুলি সব উন্মুক্ত। পিছনের উন্মুক্ত দরজা ও জানলা দিয়ে দেখা যায় বারান্দা, বারান্দার পর প্রাঙ্গন, প্রাঙ্গনের পর নদী, নদীর ওপর মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। আবার মেঘে ক্ষণে-ক্ষণে বিদ্যুৎ। ঘরের ভিতরে জানলার কাছে শয্যা, নীরবে যেন কারও জন্যে প্রতীক্ষা করছে। উত্তরাংশে একটি বসবার আসন তার ওপর বসে নিরস্ত্র বিকর্ণ। রাত্রি তখনও প্রভাত হয়নি। বহুদূরে শৃগাল ও কুকুরের চীৎকার। আরও দূরে সহস্র-সহস্র কণ্ঠে ক্রন্দন। মেঘের গর্জ্জন। প্রবেশ করলেন দুঃশাসন]

দুঃশা। আরে বিকর্ণ! কর্ণের শিবিরে তুই! তুই তো পাণ্ডবদের দলে ভিড়ে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিস!

বিকর্ণ। আমি যুধিষ্ঠিরের দূত হয়ে এসেছি। একটু সম্মান করে কথা বল্।

দুঃশা। হুঁ, শত্রুপক্ষ না হলে তোর গালে একটা থাপ্পড় দিতাম। আচ্ছা, কর্ণের সঙ্গে তোর কাজটাই আগে সেরে নে। যা!—তাড়াতাড়ি কর্। সকাল হলেই, আমাকে যুদ্ধে যেতে হবে।

[বিকর্ণকে নীরবে বসে থাকতে দেখে]

—কই,—যা!

বিকর্ণ। দেখছিস নে, কর্ণের দরজা এখন বন্ধ ?

দুঃশা। চোপ্ !—কর্ণ তোদের মত বক নয়। [উত্তর দরজা খুলে দিয়ে] এই দ্যাখ্। কর্ণের দরজা সব সময়ে খোলা।

বিকর্ণ। [মোলায়েম কণ্ঠে] ঠিক বলেছিস দাদা ! পৃথিবীতে কর্ণের মতো দাতা হয় না ! কর্ণ শুধু বীর নয়, দাতাকর্ণ।

দুঃশা। [সন্দিগ্ধ চিত্তে] উ-হুঁ !—খোসামোদ করছিস। তোর মতলব কি বল্‌তো ?

বিকর্ণ। মতলব [ঢোক গিলে] মানে এমন কিছু নয়। [আবার ঢোক গিলে] মানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল হবে দশম-দিবস।

দুঃশা। [আরও সন্দিগ্ধ হয়ে] হুঁ। এত রাত্রে তবে কর্ণকে ষট্‌কে শেখাতে এসেছিস ? [ধমক দিয়ে] ঠিক করে বল্ !

বিকর্ণ। [ভয়ে পেয়ে উঠে] আমি দূত। তুই দূতের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবি ?

দুঃশা। করবো। বল্ ! নৈলে দেখছিস এই দুটো হাত ?

বিকর্ণ। [আরও ভয় পেয়ে] অ্যাঁ ! নিরস্ত্র-শত্রুকে তুই বধ করবি ?

দুঃশা। হ্যাঁ,—একেবারে স্বর্গে পাঠিয়ে দেব।

বিকর্ণ। এসব কিন্তু শাস্ত্র-বহির্ভূত কাজ !

দুঃশা। ফের !

বিকর্ণ। [মিষ্টিকণ্ঠে] দাদা ! কেন মিছিমিছি ঝগড়া করছিস। যুদ্ধ যখন বেধেছে, আমরা তো সবাই মরবো।

দুঃশা। আমরা মানুষ, মানুষ যুদ্ধ না হ'লেও—মরে।

বিকর্ণ। কিন্তু নশ্বর জগতে, অমর হবার চেষ্টা তো করতে হয় !

দুঃশা। হুঁ ! সেই চেষ্টা কর্ত্তে, দেবতা সেজে বক হয়েছিস ?

বিকর্ণ। আবার বক !

দুঃশা। আলবৎ বক! তুই থেকে আরম্ভ করে, যুধিষ্ঠির এমন কি শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত—সব এক একটা বক।

বিকর্ণ। [একেবারে অবাক হয়ে] শ্রীকৃষ্ণ বক!

দুঃশা। নয়! প্রতিজ্ঞা করলো—যুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না। অথচ, অর্জ্জুনের সারথি হয়ে দিব্যি যুদ্ধ চালাচ্ছে। অর্জ্জুনকে নাকি প্রত্যক্ষ দেখিয়েছে, যে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ আর কৌরবদের-মৃত্যু—অনেক আগে থেকেই ঠিক হয়ে গিয়েছে। তবু যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্যে, সন্ধি সন্ধি করে কেঁদেই আকুল হচ্ছিল কেন? তোর শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছে,—বক—অদ্বিতীয়!

বিকর্ণ। [সক্রোধে] যত অশাস্ত্রীয় কথা! যাক্, তোকে আমি ক্ষমা করলাম।

দুঃশা। [সক্রোধে] কি? [আত্ম-সংবরণ করে] উঃ—তুই এখন শত্রুপক্ষ, তাই তোকে ক্ষমা করা ছাড়া যে আমার উপায় নেই। এখন কি মতলবে এসেছিস তাই বল্?

বিকর্ণ। বলতে আর দিচ্ছিস কই! ভীষ্ম তো ভীষণ যুদ্ধ সুরু করেছে। কর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছে, নৈলে—

দুঃশা। [বাধা দিয়ে] নৈলে, কর্ণ যোগ দিলে—তোরা কবে ভীষণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতিস! কিন্তু ভয় নেই, ভীষ্ম যতদিন যুদ্ধ করবে—কর্ণ অস্ত্র ধারণ করবে না। এটা কর্ণের শপথ! যা, শুনলি তো! এবার পালা! [বিকর্ণকে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে] কি? এখনো গেলিনে?

বিকর্ণ। আমার খুব দুঃখ হচ্ছে!

দুঃশা। [সকৌতূহলে] খুব দুঃখ হচ্ছে! কেন বলতো?

বিকর্ণ। ভীষ্ম নাকি পাঁচটা বাণ বেছে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, সেই পাঁচটা বাণে—আজই পঞ্চ-পাণ্ডবকে বধ করবে।

দুঃশা। তা তো করেছেই! আর ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা মিথ্যে হয় না।

বিকর্ণ। তাই তো কর্ণের জন্যে ভাবনা হচ্ছে!

দুঃশা। বটে! মরবে পঞ্চপাণ্ডব, আর ভাবনা হচ্ছে কর্ণের জন্যে! তোর চালাকিটা কি বল্‌তো?

বিকর্ণ। কর্ণ তো আগে থেকেই প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে যে, সে যুদ্ধে অর্জ্জুনকে বধ করবে। এখন ভীষ্মই যদি অর্জ্জুনকে বধ করে, তবে কর্ণের কি হবে বল দেখি? কর্ণ-প্রতিজ্ঞা মিথ্যে হয়ে যাবে!

দুঃশা। তাই দুঃখ জানাতে, যুধিষ্ঠির তোকে পাঠিয়েছে কর্ণের কাছে? উঃ—তোদের ধ্বংস করতে একটা কুরুক্ষেত্রে কুলুবে না। মনে করেছিস, কর্ণ এই শুনে—পাণ্ডবের হয়ে ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ সুরু করে দেবে? চল্‌! তোকে কর্ণের কাছে নিয়ে যাব, চল্‌!—

[বিকর্ণকে ধরে নিযে উত্তর দরজা দিযে প্রস্থান। রথের শব্দ। প্রবেশ করলেন দক্ষিণ দরজা দিয়ে পাঁচটি তীর হাতে করে ভীষ্ম। ঘরে কাউকে না দেখে, আসন গ্রহণ করে অপেক্ষা করলেন]

দুঃশা। [অবাক হয়ে] ঠাকুরদা! [পরে] চুপি চুপি এসে বসে আছ, ব্যাপার কি বল'তো?

ভীষ্ম। কর্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো!

দুঃশা। সত্যি বুঝি? তবে সেটা না বলে দিলেও—বুঝতে পারতাম। কর্ণ কিন্তু শিবিরে নেই ঠাকুরদা। বিকর্ণকে বসিয়ে রেখে এসেছি, কর্ণের মন্ত্রণা-কক্ষে। কিন্তু, তোমাকে নিয়ে কোথায় বসাই বলতো?

ভীষ্ম। [সহাস্যে] কর্ণের এটা শয়ন-কক্ষ বুঝি?

দুঃশা। কেন? তুমি কর্ণের কাছে ঘুমুতে এসেছ নাকি? তাই বটে! সারাজীবন আইবুড়ো হয়েই রৈলে, রাত্রে তো ঘুম হয় না!

ভীষ্ম। যারা আইবুড়ো নয়, তাদের খুব ঘুম বুঝি ?

দুঃশা। ঠাকুরদা, বিয়ের রস তো পেলে না! নৈলে জানতে পারতে, ঘুমের চেয়ে—ঘুমের ধুমটা বেশী! এখন কি করবে, তাই ভাবো।

ভীষ্ম। বেশ, তবে আমি এখেনেই অপেক্ষা করবো।

দুঃশা। তবে তাই করো। সারা জীবনটা তো তোমার অপেক্ষা করেই গেল! আর সব চেয়ে বিপদে পড়েছ ইচ্ছা-মৃত্যু হ'য়ে। বাঁচতে ইচ্ছে নেই, কিন্তু মরবার ইচ্ছে করাটাও শক্ত। অথচ তোমার মরাও যা, বেচে থাকাও তাই।

ভীষ্ম। [উঠে দাঁড়িয়ে চঞ্চল হয়ে] একি! হঠাৎ এ-কথা কেন দুঃশাসন ?

দুঃশা। মানুষ, দেবতা হবার লোভটা যদি সামলাতে পারে; মানুষ হয়েই যদি সন্তুষ্ট থাকে, তবে পৃথিবীতে অনেক অশান্তি আর হয় না। তুমি ভুল করেছ ঠাকুরদা,—দেবতা হবার লোভ করে! তাই, কুক্ষণে একটা প্রতিজ্ঞা করে ফেল্‌লে। আবার লোক-লজ্জার ভয়ে, দেবতা হবার লোভে, সেটা ভাঙতেও পারলে না! সারা জীবনটা কেবল দুর্ভোগ বয়েই কেটে গেল!

ভীষ্ম। আমি ভীষ্ম! সেই ভীষ্ম আমি, আজ প্রতিজ্ঞা করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছি। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, তোমার মুখ দিয়ে—এ-সব আমাকে কে শোনাচ্ছে দুঃশাসন ?

দুঃশা। শোনাচ্ছে মাটীর সন্তান, এই মানুষ। ঠাকুরদা ভীষ্ম! [থেমে সংশোধন করে] না! দেবব্রত। দেবতা-ভীষ্ম হবার লোভে, মানুষ-দেবব্রত তুমি আত্মহত্যা করেছ! দেবত্বের মোহে, ইচ্ছা-জীবনের বর প্রত্যাখ্যান করে—তুমি স্বেচ্ছায় ইচ্ছা-মৃত্যুর

অভিশাপ গ্রহণ করেছ! ভীষ্ম! তাই তুমি আযৌবন স্থবির, তোমার দম্ভ—তোমার বার্দ্ধক্যের আর্ত্তনাদ। পৃথিবীতে তুমি আর একটা বক্‌!

ভীষ্ম। বক্‌! এত বড় স্পর্দ্ধার কথা এই আমি প্রথম শুনলাম। জানো তুমি ভীষ্মের পরিচয়? এই বিশ্বসৃষ্টি, সে এক-নিমেষে ধ্বংস করে দিতে পারে?

দুঃশা। হয়তো পারে। কিন্তু, একটা কাজ সে কিছুতেই পারে না ঠাকুরদা।

ভীষ্ম। ভীষ্ম পারে না?

দুঃশা। না। পারে না। ভীষ্মত্ব, ত্যাগ করতে পারে না ভীষ্ম!

ভীষ্ম। [চমকে] না, পারে না, সত্যিই তা পারে না ভীষ্ম! [এগিয়ে এসে] দুঃশাসন! আমার মনের এই গোপন-সংবাদ তুমি কেমন করে পেলে?

দুঃশা। ঠাকুরদা! আজ এই প্রথম তোমাকে বুঝেছি। প্রতিজ্ঞা করেছ, পঞ্চপাণ্ডবকে তুমি বধ করবে। তারপর তোমার স্মরণ হয়েছে, কর্ণের প্রতিজ্ঞার কথা! তাই, তার কাছে ছুটে এসেছ একটা মীমাংসার সন্ধানে। যে কর্ণ তোমার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করে অস্ত্রধারণ করেনি, তার জন্যে অকস্মাৎ কেন তোমার এত ব্যাকুলতা ভীষ্ম?

ভীষ্ম। [ধীরে ধীরে মুখ প্রফুল্ল হল] হাঁ! কিন্তু তোমার কি ধারণা দুঃশাসন?

দুঃশা। পাণ্ডবদের বধ করে—প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্বার মনোবল তোমার নেই, অথচ সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্বার সাহস,—তাও তোমার নেই। তুমি এসেছ কর্ণের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে নয়, নিজের প্রতিজ্ঞার

দায় থেকে অব্যাহতি পেতে! ভীষ্ম! ভীষ্মত্ব ত্যাগ করতে পেলে, তুমি মুক্তি পাও!

ভীষ্ম। অর্ব্বাচীন! ভীষ্ম মিথ্যে উচ্চারণ করে না। ভীষ্ম সে চিরদিনই ভীষ্ম! [আসনে বসে] তবে কর্ণ যদি নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করে, ইচ্ছা-মৃত্যু আমি,—সে-যুদ্ধে আমি তাকে বধ করবো না। কর্ণকে আমি স্নেহ করি।

দুঃশা। স্নেহ করো! তোমার আজীবন-বার্দ্ধক্যের ঐ আর একটা পরিচয়। তোমারই স্নেহের সৃষ্টি কুরু-পাণ্ডব, তোমার স্নেহকেই আশ্রয় করে—আজ কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। আশ্চর্য্য যে, তোমার ঐ স্থবির দেহে—এখনও মৃত্যু-ইচ্ছা জাগেনি!

ভীষ্ম। [বিদ্যুদ্বেগে উঠে আর্ত্তনাদ] দুঃশাসন!

দুঃশা। [বিস্মিত হয়ে] একি! ভীষ্মের আর্ত্তনাদ!

ভীষ্ম। মূর্খ! ভীষ্ম কখনও আর্ত্তনাদ করে না! -এ অসম্ভব মিথ্যে যারা তোমার মত অর্ব্বাচীন, শুধু তারাই কল্পনা করতে পারে।

দুঃশা। এই কথা!

ভীষ্ম। যাও, আমাকে আর বিরক্ত কোরো না দুঃশাসন!

দুঃশা। তোমার সমস্ত চুলগুলো পেকে গিয়েছে ঠাকুরদা।

ভীষ্ম। [ম্লান হাস্যে] হ্যাঁ! আমি বৃদ্ধ হয়েছি।

দুঃশা। তা হয়েছ! তবে কেমন করে, কখন হলে, তা জানতেও পারলে না ঠাকুরদা!

ভীষ্ম। না। তার প্রয়োজনও ছিল না।

দুঃশা। প্রয়োজন এসেছিল, যেদিন তুমি প্রথম দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলে।

ভীষ্ম। আবার!

দুঃশা [কানে না তুলে] একদিন যুবকও ছিলে, যৌবনও এসেছিল!

কিন্তু সেই অপূর্ব্ব যৌবন কখন এল, আর কখন যে গেল, তোমার জানাই হল না! হয়তো একজন মনে করিয়ে দিতো যে তোমার স্ত্রী হতে পারতো!

ভীষ্ম। [চঞ্চল হয়ে] দুঃশাসন, তুমি কি ভীষ্মকে ঠাট্টা করছো?

দুঃশা। আমি মানুষ ঠাকুরদা! প্রতিজ্ঞা করে ভীষ্মও নই, দান করে কর্ণও নই, কি ধর্ম্ম করে যুধিষ্ঠিরও নই। আপন মনে শুধু ঠাট্টাই আমি করি। আচ্ছা, বল তো ঠাকুরদা, স্ত্রীলোক দেখতে কেমন?

ভীষ্ম। [চঞ্চল হয়ে উঠে] না, এসব আমি সহ্য করবো না দুঃশাসন!

দুঃশা। উঁহুঁ, লজ্জা কোরোনা! আমি জানি, তুমি যদি মন খুলে উত্তর দাও, বলবে—পুরুষের চোখে স্ত্রীলোক বেশ ভালই! আচ্ছা, নববধূর সলজ্জ-চকিত-দৃষ্টিটি কেমন লাগে ঠাকুরদা?

ভীষ্ম। [বসে হাস্যমুখে] বটে! কিন্তু ঐটি তো আমি দেখিনি দুঃশাসন!

দুঃশা। তবু মনটা খুসী হয়েছে। যাক্! ওর জন্যে, এই বুড়ো-বয়সে দুঃখ করে আর লাভ হবে না! বল তো ঠাকুরদা, উদ্ভিন্ন-যৌবনা নারীর ভালবাসার সম্ভাষণ, একটি নাম ধরে ডাকা, যেমন দেবব্রতকে ব্রত, আস্তে চুপি চুপি দু'একটি গোপন কথা, একটু ইঙ্গিত, শেষে ছুটে পালিয়ে যাওয়া,—এ তোমার কেমন মনে হয়?

ভীষ্ম। [সহাস্যে] তোমরা যুবক, তোমাদের নিশ্চয়ই ভাল মনে হয়!

দুঃশা। তবে তোমাকে একটা শক্ত প্রশ্ন করি? ঠাকুরদা, তুমি কাউকে কখনও ভালবেসেছিলে?

ভীষ্ম। [লাফিয়ে উঠে] দুঃশাসন! জান আমি—

দুঃশা। রাগ কোরোনা! আজ এক মহাপ্রতিজ্ঞা যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার

জন্যে অপেক্ষা করছে! একটা স্পষ্ট কথার, সত্য উত্তর দাও? কোনও রমণী ?

ভীষ্ম। বিশ্বে যত নারী জন্মগ্রহণ করেছে, প্রত্যেকে ভীষ্মের মা।

[উপবেশন]

দুঃশা। তবে মনে করো জন্মগ্রহণ করেনি, এমনি একটা নারী? কিম্বা, তারই একটা স্বপ্ন? [ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে চাইলেন] আচ্ছা, থাক, থাক! তোমার লজ্জা করছে! বেশ, তবে জীবনে কোনও একটা ফাগুণ-অপরাহ্ণের কথা মনে করো। কিম্বা বসন্তের কোনও একটা অম্লান পূর্ণিমা। স্নিগ্ধ-সমীরণে ভেসে আসে দূর চামেলী ও বকুলের গন্ধ। আকাশে নিঃশব্দ-নীলিমার বুকে, গভীর-প্রতীক্ষা। কোনও এক লতাগুল্মের পাশে, কিম্বা প্রবাহিতা কোনও এক মৃদুধ্বনি স্রোতস্বিনীর তীরে বসে, তুমি স্বপ্ন দেখ্‌ছো। তোমার কর্ণে বাজলো কঙ্কনধ্বনি, পেলে সুগন্ধ অঙ্গবাসের গন্ধ, যেন খুব কাছেই তোমার, -স্পর্শ,- যেন আরও কাছে, এগিয়ে এল, যেন ঠিক একেবারে পেছনে, তার নিঃশ্বাসের স্পর্শ, তারপর আরও এল, তার সুরভিময় কেশের স্পর্শ, তোমার সমস্ত শরীরে খেলে গেল বিদ্যুতের শিহরণ, তুমি—

ভীষ্ম। [অবাক হয়ে অস্ফুটকণ্ঠে] তুমি কি আমার কৈশোরের কথা বলছো দুঃশাসন? কিন্তু সে ছায়া! একটি প্রতিজ্ঞায়, আমি তা শূন্যে মিলিয়ে দিয়েছি!

দুঃশা। হুঁ। মিলেছে! আচ্ছা, তবে যৌবনের কথাও একটু বলি। মনে করো--সে আর একটা দিন। কর্ম্ম তোমাকে আহ্বান করেছে, তোমার সুগঠিত-দেহের প্রত্যেকটী পেশী হয়েছে চঞ্চল, আকাশে মধ্যাহ্ণ-সূর্য্য, পায়ের তলে প্রসারিত-ধরণী, সম্মুখে নীলাম্ভ

দিগন্ত-রেখা। তোমাকে চিনেছে পথ, তোমাকে ডেকেছে ঘর, তোমাকে চেয়েছে বিশ্ব। অনন্ত আবেগে দুলে উঠেছে তোমার মন, গতির-ছন্দে বাহু তোমার প্রসারিত, অসীম-শক্তিতে দৃষ্টি তোমার উর্দ্ধমুখী। হঠাৎ চাইলে বামে, ফুটন্ত একটি বেলফুল চকিতে হেসে উঠলো। চাইলে পায়ের দিকে,—সলজ্জ তৃণ-পুষ্প হেসে মাথা নীচু করলো। চাইলে দক্ষিণে, ধীরে এগিয়ে এসে একটি হাত বাড়িয়ে দিল তোমার দিকে—একটি নারী! দীপ্ত-যৌবনা, স্মিতাননা, লাবণ্যময়ী—

ভীষ্ম। [বাধা দিয়ে] না, আমার যৌবনের কথা আর নয় দুঃশাসন। তুমি থামো –

দুঃশা। আর একটুখানি ঠাকুরদা। পুষ্পের মত কোমল দেহলতা তার, শরীরের শিরায়-শিরায় ছড়িয়ে যায় বন্যাময় উন্মাদনার মত; স্খলিত-অঞ্চলা, বুকের মধ্যে ঝরে পড়ে পুষ্পের আশ্চর্যময় মূর্চ্ছার মত। তখন তার অধর থাকে অধরে, বুক থাকে বুকে, তার বাহু থাকে গলায়, তার দেহলতা থাকে–

ভীষ্ম। [চীৎকারে] দুঃশাসন! আমি আজীবন চিরকুমার, আমি ভীষ্ম! জান তুমি, দেবব্রতের যৌবন,—ভীষ্মের জীবন-ইতিহাসে তার স্থান নেই?

দুঃশা। আচ্ছা থাক্-থাক্! তবে সেটা নারী না হয়ে,—মনে করো, সে একটা পুরুষ। যুবক না হয়ে,—মনে করো, যে তোমাকে জড়িয়ে ধরে—তোমার গালে একটা চুম্বন এঁকে দিল,—সে একটা নব্বুই বৎসরের বৃদ্ধ।

ভীষ্ম। বৃদ্ধ!—হা-হা-হা –[উচ্চহাস্য]

দুঃশা। [ব্যস্ত হয়ে] হেসোনা ঠাকুরদা, দাঁড়াও! আগে দরজা বন্ধ করি।

ভীষ্ম। ওকি! দরজা বন্ধ করছো কেন?

দুঃশা। ব্যাসদেব নাকি আমাদের নিয়ে এক মহাকাব্য লিখেছে। সেই কাব্যে যদি লিখে ফেলে ভীষ্ম হেসেছে,—আর এম্‌নি ছেলেমানুষের মত, তাহলে যারা পড়বে, তারা কেউ তোমাকে সম্মান করবে না।

ভীষ্ম। বল কি! কিন্তু আমি তো হাসি।

দুঃশা। লুকিয়ে, একটু লুকিয়ে হেসো! নইলে, তোমার ভীষ্মত্ব নাকচ হয়ে যাবে!

ভীষ্ম। ভীষ্মের যদি এই সত্যি-রূপ হয় দুঃশাসন, তবে এই মুহূর্তেই আমি ভীষ্মত্ব ত্যাগ করবো।

দুঃশা। পারবে না ভীষ্ম, পারবে না। আচ্ছা। তুমি বৃদ্ধ হয়েছ বলে, তোমার দুঃখ হয় ঠাকুরদা?

ভীষ্ম। [গম্ভীর হয়ে] জানি নে! সুখ-দুঃখের অনুভূতি আমার নেই।

দুঃশা। বুঝেছি। এত দুঃখ যে, অনুভূতিও নিস্তেজ হয়ে গিয়েছে! দুঃখ পাও, অনেক দুঃখ! তবু মুখ ফুটে যার কাছে প্রকাশ করবে -- এমন একটা কেউ তোমার নেই! ওকি? তোমার চোখ ছল-ছল করছে ঠাকুরদা?

ভীষ্ম। [অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে] না। আমি শুধু অবাক হয়ে শুনছি! তুমি কে দুঃশাসন? তুমি কি নিয়তি? ইচ্ছা-মৃত্যু ভীষ্ম, তার মনে তুমি মৃত্যু-ইচ্ছা জাগিয়ে তুল্‌ছো!

দুঃশা। তাতে গলাটা ভারী-ভারী হচ্ছে কেন ঠাকুরদা! জীবনকে জানো নি বলেই, তোমার এই ব্যর্থতা! যদি জান্‌তে, তবে বুঝতে—মৃত্যু আছে বলেই,—জীবন এত সুন্দর, এত মধুর এই যৌবন! বেশ, তোমাকে আর একটা প্রশ্ন করি?

ভীষ্ম। না। তোমার প্রশ্ন আর আমি শুনবো না। আমি নিষেধ করছি।

দুঃশা। [বাধা দিয়ে] খুব একটুখানি ঠাকুরদা! আজ যদি জীবনের গোড়া থেকে সুরু করবার সুযোগ তুমি পেতে, বলো,—তুমি কি চাইতে ভীষ্ম হয়ে ইচ্ছা-মৃত্যু নিতে? না, দেবব্রত হয়ে—যৌবনের মধ্যে দিয়ে, আমৃত্যু নিজেকে উপভোগ করতে?

ভীষ্ম। [দৃঢ়কণ্ঠে] এবার চুপ করো দুঃশাসন! ভীষ্মকে বধ করলে তুমি! জীবনে এই প্রথম জাগলো আমার মৃত্যু-ইচ্ছা। আজ—আজই আমার শেষ-যুদ্ধ!

[দরজায় করাঘাত। দুর্য্যোধনের ছদ্মবেশে অর্জ্জুন অপেক্ষমান]

ছঃঅঃ। [বাইরে] দরজা খোলো! শীগগির।

দুঃশা। কে?

ছঃ অঃ। [বাইরে] আমি কুরুরাজ দুর্য্যোধন।

দুঃশা। দাদা!

[তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিতে, ছদ্মবেশী অর্জ্জুন ঘরে ঢুকে ভীষ্মকে দেখে দুঃশাসনের দিকে ফিরলেন]

—দাদা তুমি হঠাৎ?

ছঃ অঃ। পাশের ঘরে যাও!

[দুঃশাসন উত্তর দরজা খুলে চলে গেলেন]

—ঠাকুরদা ভীষ্ম! যে পাঁচটি বাণ দিয়ে আপনি পাণ্ডবদের বধ করবেন, তা আপনার কাছে আছে?

ভীষ্ম। আছে। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে কিনা,—আমার সন্দেহ হচ্ছে!

ছঃ অঃ। সেই সন্দেহ হতেই আমি ছুটে এসেছি! যুদ্ধ আরম্ভ হতে আর সিকি-দণ্ডও নেই! সেই পাঁচটি মৃত্যুবাণ, আপনি আমাকে দিন।

ভীষ্ম। কারণ?

ছঃঅঃ। কারণ প্রথম পাণ্ডবদের ষড়যন্ত্রের ভয়, দ্বিতীয় পাণ্ডবদের প্রতি আপনার অহেতুক-করুণা। ঐ মৃত্যুবাণ দিয়ে, আমি তাদের বধ করবো।

ভীষ্ম। [তূণ থেকে পাঁচটি তীর দিয়ে] নাও। যে কেউ এই তীর নিক্ষেপ করতে পারে। এই অস্ত্র ব্যর্থ হবে না। যাও, আমি নিশ্চিন্ত কুরুরাজ! তবে মনে রেখো,—আজ আমার শেষ-যুদ্ধ, আর আজই আমার শেষ! না, কথা কোয়ো না, যাও!

[ছদ্মবেশী অর্জ্জুনের প্রস্থান]

[উত্তর দরজার কাছে গিয়ে] দুঃশাসন!

[দুঃশাসন প্রবেশ করলেন]

দুঃশা। বিকর্ণ চলে গিয়েছে, ঠাকুরদা! ব্যাপারটা কিন্তু সন্দেহজনক! মনে হচ্ছে, কোথায় একটা ষড়যন্ত্র চল্‌ছিল।

ভীষ্ম। চলুক! আজ আমি মানুষ, মানুষের মতই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেব! জানো দুঃশাসন, পাণ্ডব-বধের জন্যে—যে পাঁচটি বাণ্ বেছে রেখেছিলাম, দুর্য্যোধন তা আমার কাছ থেকে নিয়ে গেল! আমি এখন নিশ্চিন্ত!

দুঃশা। দাদার একি দুর্বুদ্ধি হল! ঠাকুরদা! সেই বাণ নিক্ষেপ করবে দাদা, এ সম্ভব?

ভীষ্ম। তোমার দাদা কেন, যে-কেউ সে অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে। করুক! ভীষ্মের মৃত্যু-ইচ্ছা,—আজ সকলে জানুক! দুঃশাসন!

ভীষ্মকে না কি তোমার হাসতে মানা। আজ-আজ প্রাণ খুলে হাসবো! হা-হা-হা-হা-হা [উচ্চহাস্য]

[কর্ণ দক্ষিণ দরজা দিয়ে ঢুকলেন]

এসো কর্ণ। অবাক হয়ে কি দেখছো? আমি ভীষ্ম। কি, বিশ্বাস হচ্ছে না?

কর্ণ। মনে হচ্ছে, আপনি চীৎকার করে হাসছিলেন!

ভীষ্ম। হ্যা। আজ আমি খুব নিশ্চিন্ত! যে পাঁচটি বাণ দিয়ে আমি পাণ্ডব-বধ করতাম, এইমাত্র দুর্যোধন তা' নিয়ে গেল।

কর্ণ। দুর্যোধন! দুর্যোধনকে রথে করে আমি এইমাত্র তার প্রাসাদে রেখে এলাম! ভীষ্ম! আপনি অর্জ্জুনের কথা বল্‌ছেন।

ভীষ্ম। অর্জ্জুন! কর্ণ, তুমি সত্য বলছো,—অর্জ্জুন?

কর্ণ। হ্যাঁ। আমি এইমাত্র তাকে রথে উঠ্‌তে দেখ্‌লাম।

দুঃশা। আমি বলেছি,—এ ষড়যন্ত্র! কুরুরাজের ছদ্মবেশে, অর্জ্জুন প্রতারণা করে গেল! ধিক্ এই পাণ্ডবকে!

[মেঘ সরে গেল। আকাশে রক্তিম-সূর্য্য! ঘন ঘন তূর্য্য ও শঙ্খধ্বনি]

ভীষ্ম। যুদ্ধের আহ্বান! উত্তম! এ প্রতারণার উত্তরে, মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি এমন যদ্ধ করবো—যা পৃথিবীতে হয়নি! কর্ণ, আমার প্রতিজ্ঞা এই প্রথম মিথ্যে হল। [প্রস্থান]

কর্ণ। তুমি বিমর্ষ কেন দুঃশাসন?

দুঃশা। আমার মাথায় বোধ হয় দুষ্ট-সরস্বতী চেপেছিল। নৈলে—দাম্ভিক ভীষ্মের নিদ্রিত-বুদ্ধিকে ঠাট্টা করতে গিয়ে, জাগিয়ে দিতুম না। কুরুক্ষেত্রে, শেষে বকেরাই জয়ী হবে অঙ্গরাজ!

কর্ণ। কেন! কর্ণ কি বেঁচে নেই দুঃশাসন! তার এই অক্ষয় কবচ-কুণ্ডল, তার সযত্ন রক্ষিত দিব্য-অস্ত্র, এ সব মিথ্যে?

দুঃশা। মিথ্যে নয়, তবে একেবারেই নিরর্থক! আর সেই-কথা বলতেই আমি এসেছিলাম।

কর্ণ। নিরর্থক! যে কবচ-কুণ্ডল অভেদ্য, যে অস্ত্র অব্যর্থ, তা নিরর্থক! তুমি কি উন্মাদ দুঃশাসন?

দুঃশা। উন্মাদ তোমরা কর্ণ! হয়—দেবতা হবার লোভ ত্যাগ করো, নয় -অস্ত্র, বর্ম্ম, শিক্ষা, সব ব্যর্থ হয়ে যাবে! মনে রেখো, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব-পক্ষে। ভীষ্মের মৃত্যুর পর, অস্ত্র ধারণ করতে প্রস্তুত হও অঙ্গরাজ! [দুঃশাসনের প্রস্থান।

কর্ণ শয্যার উপর বসলেন। একটা অবসাদে দেহ এলিয়ে গেল! দূরে যুদ্ধে অস্ত্রের প্রলয়ঙ্কর বজ্র-সদৃশ শব্দ! লোহিত বিদ্যুতের মত, উজ্জ্বল জ্যোতিচ্ছটার চমক। পরে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার! কর্ণ তখনও আত্মমগ্ন! সহসা সেই অন্ধকারের মধ্যে, ঘন ঘন আলোচ্ছটা! দেবতাদের স্তব! কর্ণ জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। ক্লান্ত অবসন্নদেহ, জান্‌লার একটি দিক অবলম্বনের মত হাত দিয়ে ধরলেন। মাথা ঝুঁকে পড়লো। ধীরে ধীরে বিছানার উপর নেমে এল, তাঁর দীর্ঘ-দেহ। তারপর, অকস্মাৎ যেন বিছানার ওপর পড়লেন জ্ঞানহীনের মত। অবশ-দেহ কুঁচকে পড়ে রইলো বিছানার ওপর,—কতকগুলো রঙিন কাপড়ের পুঁটুলির মত। ধীরে ধীরে যুদ্ধের কোলাহল থেমে গেল, ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে গেল আকাশ, একটি করে শেষে অনেকগুলি দেখা দিল নক্ষত্র। একফালি চাঁদ হেসে উঠল আকাশের একদিকে! নীলাভ আলোকে উজ্জ্বল হল কর্ণের শয়ন-কক্ষ। দূরে বংশীর মধুর তান!—বাতাসে উড়তে লাগলো কর্ণের অঙ্গের বসন! রাত্রি। গভীর রাত্রি। পিছনের বারান্দা থেকে এগিয়ে

এল ছায়ামূর্ত্তি, সূক্ষ্ম-আবরণে নিজেকে গোপন করে স্বয়ং দ্রৌপদীর! সেই দ্রৌপদী-মূর্ত্তি পিছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলো। মাথা তুলে চাইলেন কর্ণ! মূর্ত্তি তাঁর দিকে দৃষ্টি রেখে, পিছনে হেঁটে একপা-একপা করে দক্ষিণ দরজার কাছে গিযে দাঁড়ালো। উঠলেন কর্ণ! বিছানা ছেড়ে নীচে নেমে দাঁড়ালেন। তারপর চাইলেন। মূর্ত্তি নিঃশব্দে তার মুখাবরণ উন্মোচন করলো। কর্ণ নির্নিমেষ-চোখে চেয়ে, দু'হাত বাড়িয়ে ধীরে অগ্রসর হলেন]

দ্রৌঃ মূঃ। না! ·না! · না! ·

কর্ণ। [দাঁড়ালেন। অপলক চেয়ে এক-মুহূর্ত্ত পরে] কৃষ্ণা!

দ্রৌঃ মূঃ। না! না!···না!

কর্ণ। না! তবে,—তবে এত রাত্রে কর্ণের শিবিরে কেন? এসো, এগিয়ে এসো! বলো কৃষ্ণা?

দ্রৌঃ মূঃ। কৃষ্ণা! না!···না! আমাকে ওনামে ডেকোনা কর্ণ! না!—

কর্ণ। না! আমার দুটী প্রিয়-নাম। একটী কৃষ্ণ, আর একটী কৃষ্ণা! পৃথিবীতে আর কোনও নামতো আমি জানিনে কৃষ্ণা! আর সেই তারা দুটীই, আমার প্রিয়-শত্রু। একজন সারথী হয়ে, অপরের হাত দিয়ে তীর ছুড়বে; আর একজন অশ্রু হয়ে আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করবে,—আমি প্রতিপক্ষের অস্ত্র ব্যর্থ করতে নিজের অস্ত্র খুঁজে পাব না। বলো, কথা কও, কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা। না—না—কৃষ্ণা নামে নয়! দ্রুপদনন্দিনী আমি—দ্রৌপদী!

কর্ণ। দ্রৌপদী! না,—কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা। না, আমি পঞ্চপাণ্ডব-গৃহিনী—আমি পাণ্ডব-বধূ!

কর্ণ। সেই এক-কথা, সেই একভাবে নির্দ্দয় প্রত্যাখ্যান! তবে, প্রত্যেক-রজনীতে কেন তোমার এই অভিসার! কেন আস, ভাগ্য-প্রবঞ্চিত এই কর্ণের কক্ষে—তোমার ঐ রূপ, ঐ দৃষ্টি, ঐ অপরূপ-লাবণ্য নিযে? কেন আনো নিত্য এর স্বপ্ন—যা সত্য হয় নি, হয় না, হবেও না কৃষ্ণা! কৃষ্ণা-রজনীর মত তামসময়ী, কেন তুমি প্রহেলিকা—নিত্য আমাকে বঞ্চনা করো? কেন? কেন?

কৃষ্ণা। কেন! আমি নারী! মানবীর মন নিয়ে—মানবের জন্তে ব্যগ্র হয়ে অপেক্ষা করে যে,—সেই নারী আমি! কর্ণ, কেন তুমি ভালবাস আমাকে, কেন কষ্ট পাও, কেন কর ক্রোধ? আমিতো বলেছি, সর্ব্বসমক্ষে বলেছি,—"তোমাকে আমি ঘৃণা করি!" তবে কেন তুমি আকর্ষণ কর? কেন? কেন?

কর্ণ। কেন? তবে স্মরণ করে খ্যাখো, সেই স্বয়ম্বর-সভার কথা! স্মরণ করো, যখন ধনুর্বান হস্তে আমি সেই সভায় প্রবেশ করলাম! স্মরণ করো, সভামধ্যে কিশোরী-কৃষ্ণার সঙ্গে—তরুণ-কান্তি কর্ণের দৃষ্টি বিনিময়! ছিল না কি সে দৃষ্টিতে, আশার সংবাদ? নিঃশব্দ আমন্ত্রণ আর ব্যগ্র শুভাকাঙ্খা? সে কি মিথ্যে?

কৃষ্ণা। মিথ্যে! না, সে যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি—তোমার জন্ম-পরিচয়। লক্ষ্য-ভেদে এগিয়ে এলে তুমি, চোখে তোমার দিব্য-বিভা, মুখে দীপ্ত-কান্তি, পদক্ষেপে কেঁপে উঠলো ধরণী! কে এই অরুণ-কান্তি কৃষ্ণ-সদৃশ স্বর্গীয় বিভা-মণ্ডিত তরুণ? বিস্ময়ে শুধালাম সভাকক্ষে! উত্তর এল, শত-কণ্ঠে সমুচ্চ ধিক্‌কার,--"সূতগৃহে পালিত জন্ম-পরিচয়-হীন ভাগ্যান্বেষী যুবক!" দুঃখে, অভিমানে, ক্রোধে, জ্বলে উঠলো মন! চীৎকার করে জানালাম প্রতিবাদ,—

"শূদ্রসূত-পুত্র ভাগ্যান্বেষী যুবক! আমি তোমাকে বরণ করবোনা, আমি ঘৃণা করি তোমাকে!" একি মিথ্যে? বলো,—না?

কর্ণ। না, আমি ভুলি নি! সেই সচকিত-আর্ত্তনাদ তোমার, আজও ভুলি নি কৃষ্ণা! ভালবেসেছিলাম, তাই সেই আর্ত্তনাদে নীরবে আত্মসমর্পন করে—সভা-কক্ষ ত্যাগ করে এসেছিলাম। নৈলে, সেদিন স্বয়ম্বর সভায় বীর্য্যশুল্কা করে—তোমাকে আমি হরণ করতাম! আত্মসমর্পণ করেছিলাম, কিন্তু যে অর্ঘ্য দান করেছিলাম, সেই প্রেম আমার, আমি ফিরে নিতে পারিনি! আমি কর্ণ!

কৃষ্ণা। কর্ণ! হ্যাঁ, মনে মনে আজও জানি, স্বয়ম্বর সভার কর্ণ, আজও কর্ণ! তবে বলো, আজ যদি তোমার দান আমি চাই? আমার শেষ-গ্রহণ, আর তোমার শেষ-দান?

কর্ণ। দান? আর শেষ? তবে এই কি তোমার আমার শেষ-সাক্ষাৎ!

কৃষ্ণা। সাক্ষাৎ? হ্যাঁ,- এ যদি সাক্ষাৎ নয়,—এ যদি স্বপ্নও, -তবু এই আজ শেষ! বলো, এই শেষ-বারের জন্যে আমি দাবী করি আমার অর্ঘ্য? দাও, -পাণ্ডবের ওপর তোমার ক্রোধ, তোমার অন্তরের জ্বালা, অদৃষ্টেরপর তোমার প্রতিহিংসা, সব, সব আমাকে দাও, কর্ণ!

কর্ণ। কর্ণ! সূতপুত্র কর্ণ! কৃষ্ণা, তবে শোনো সেই কথা, সর্ব্বসমক্ষে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, "একমাত্র অর্জ্জুন ছাড়া—আর কোনও পাণ্ডব-ভ্রাতাকে আমি আঘাত কর্ব্ব না।"

কৃষ্ণা। না! আমি চাই, আমার পূর্ণ-অর্ঘ্য।

কর্ণ। অর্ঘ্য? বেশ, গ্রহণ করো কৃষ্ণা,—সাক্ষী আমার ধনুর্ব্বান, কবচ-কুণ্ডল,—আমার ক্রোধ, আমার জ্বালা, আমার অভিমান,—আমি কৃষ্ণাকে দান করলাম! যাও,—এবার নিজের অহঙ্কারে

নিশ্চিন্ত হযে চলে যাও নারী! বিদায়—কৃষ্ণা,—এই শেষ-বিদায়!

কৃষ্ণা। বিদায! [মুখ আবৃত করে] বিদায়—বীর! [কর্ণ অগ্রসর হলেন] না! না! না!

কর্ণ। [পিছিযে] না!

[পিছু-হেঁটে দক্ষিণ দরজা দিযে দ্রৌপদী-মূর্ত্তির অন্তর্ধান। কর্ণ চেয়ে রইলেন! তারপর শয্যায ফিরে বস্‌লেন! মুখ-গুঁজে পড়ে রইলেন মৃতের মত! আকাশ পাণ্ডুর-বর্ণ। দু-একটা নক্ষত্র। কিন্তু, চাঁদ অস্ত গিয়েছে। রাত্রির শেষ-অংশ! বাঁশী থেমে গিযেছে, বাজছে দূরে করুণ-সুরে একটা বীণা। কুন্তী-মূর্ত্তির দক্ষিণ দরজা দিযে প্রবেশ]

কুন্তী। বৎস!

কর্ণ। বৎস! [মুখতুলে] একি! পাণ্ডব-জননী! এত রাত্রে কর্ণের শিবিরে? একি অভাবিত-ঘটনা দেবী!

কুন্তী। দেবী! -কর্ণ, নারীর রূপ কি শুধু প্রেমিকার, তার জননীর রূপ কি—তোমার একেবারেই অজ্ঞাত?

কর্ণ। অজ্ঞাত! আমি কি জানি, কে আমার জননী? পেয়েছি কি আমি জননীর ক্রোড়, তার স্তন, তার স্নেহ? তবে কেমন করে জান্‌বো, নারীর সেই অপূর্ব্ব জননীত্ব,—যা কাব্য—যা স্বপ্ন, যা—সত্যের চেয়েও সত্য, স্বর্গের চেয়েও মহীয়সী, ধ্যানের চেয়েও সুন্দর! জানো পাণ্ডব-জননী, এ আমার কত বড় দুর্ভাগ্য!

কুন্তী। দুর্ভাগ্য! না। মহাভাগ্যবান তুমি! নৈলে সমস্ত জননীর মধ্যেই যে তোমার জননীর-সংবাদ,—তা তুমি পেতে না কর্ণ। বুঝতেও না,—পাণ্ডবদের ওপর কি দুর্ব্বার আমার স্নেহ!

কর্ণ। স্নেহ! হ্যাঁ,—দেখিছি আমি—সন্তানের ওপর কি তোমার অপরিসীম আকর্ষণ, তাদের মঙ্গলের জন্তে কত তোমার চিন্তা, কত ব্যাকুল তোমার আগ্রহ!

কুন্তী। আগ্রহ। হ্যাঁ, প্রতিক্ষণ তুমি তা জেনেছ কর্ণ, তাই আমার মধ্যেই—তোমার মায়ের-স্বপ্ন দেখেছ তুমি। তাই পাণ্ডবদের মাতৃ-সৌভাগ্যে—তুমি প্রতিনিয়ত ঈর্ষায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছ,—দিবারাত্র সর্ব্বক্ষণ তাদের ধ্বংস-কামনা করেছ!—কর নি কর্ণ?

কর্ণ। [যন্ত্রণায় সঙ্গে] কর্ণ! হ্যাঁ, করেছে। কর্ণ তা করেছে দেবী। নিশ্চয়ই করেছে সে। সেই বিষাক্ত-জ্বালায় প্রতি নিয়ত জ্বলেছে সে! জান কি পাণ্ডব-জননী, পলে-পলে সে কি অন্তর্দ্বন্দ্ব তার, প্রত্যেকটী অনুপলে তিলে-তিলে সে কি যন্ত্রণাময়-মৃত্যু তার! না,—কিন্তু তবু বলো দেবী, তোমার সন্তানের মঙ্গল-কামনা দেখে হয়নি কি সে চঞ্চল! করে নি তোমার পূজা! তোমার সন্তানের ওপর, মায়ের ঐ অপূর্ব্ব স্নেহ দেখে—প্রতিরাত্রে নিঃশব্দে করেনি কি সে ক্রন্দন! পাণ্ডব-জননী! বলো,—তুমি আমার শিবিরে এসেছ, কি অর্ঘ্য তুমি চাও দেবী?

কুন্তী। দেবী! না কর্ণ, আমি মা। আমার মায়ের মূর্ত্তিতেই, তুমি আমার পূজা করেছ। তোমার বিপক্ষ পাণ্ডবদের মা—আমি সেই কুন্তী। সেই মায়ের অর্ঘ্য দেবার সম্বল, তোমার আছে কি বৎস?

কর্ণ। বৎস! —ওঃ,—ঐ একটী সম্বোধন! আছে, নিশ্চয়ই আছে। সন্তানের শ্রেষ্ঠ-পূজা তার সর্ব্বস্ব ত্যাগ! জানি দেবী, জানি, কি তোমার প্রিয়-অর্ঘ্য—সেই সর্ব্বস্ব আমার। সন্তানের মঙ্গল কামনা নিয়ে সম্মুখে দাঁড়িয়ে সেই পাণ্ডব-জননী তুমি, চাও কর্ণকে নিরস্ত্র করে—যুদ্ধে প্রেরণ করতে। মহাভাগ্যবান আমি! নৈলে,

তোমার ঐ মাতৃস্নেহ আমার বুকের-রক্ত দিয়ে সিঞ্চিত করবার সুযোগ আমি পেতাম না! জানতাম না, সন্তানের জন্যে জননীর ব্যগ্র ভিক্ষাবৃত্তি! বলো,— চাও কি তোমার সেই অর্ঘ্য? আমার দিব্য অস্ত্র? তোমার অর্জ্জুনের জীবন? —আচ্ছা, অপেক্ষা করো দেবী!

[পার্শ্ব-কক্ষ থেকে একটা তীর নিয়ে এলেন।]

কুন্তী। [পিছিয়ে] না— না—কর্ণ, না, না,—না—

কর্ণ। না। এই নাও আমার সেই অস্ত্র, যা হারিয়ে—আমি নিরস্ত্র হয়ে অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। এই নাও! [অস্ত্রটী কুন্তীর পায়ের কাছে রেখে] আমি তোমার পায়ের কাছে রেখে দিলাম, আমার যুদ্ধ-জয়।

কুন্তী। জয়! না, না! এ দিব্য-অস্ত্র তো আমি চাইনি কর্ণ! কিন্তু সত্যিই, তোমার সর্ব্বস্ব কি শুধু এই অমোঘ-অস্ত্র? শুধু এইটুকু সম্বল করে—তুমি আমার অর্ঘ্য দেবার স্পর্দ্ধা করেছ? না কর্ণ, আমি জানি তোমার শৌর্য্য! জানি আমি তোমার ঐ কবচ-কুণ্ডল, আর কি অপরিসীম-শক্তি তার! কর্ণ, ঐ কবচ-কুণ্ডলে চির-অপরাজেয় তুমি!

কর্ণ। অপরাজেয় তুমি, —অপরাজেয়! [উচ্চ-হাস্যে প্রায় ক্রন্দনের মত] কর্ণ কি চেয়েছিল জয়, কর্ণ কি চেয়েছিল যশ, কর্ণ কি চেয়েছিল কোনও রাজ্য?—কর্ণ চেয়েছিল, পৃথিবীতে শুধু এতটুকু ঠাঁই—তার মায়ের ক্রোড়; কর্ণ চেয়েছিল শুধু এতটুকু স্বর্গ,— তার মায়ের স্পর্শ; কর্ণ চেয়েছিল মায়ের এতটুকু ভৎর্সনার কাছে,—তার সারা-জীবনের পরাজয়। কিন্তু এই কবচ-কুণ্ডল? বলো পাণ্ডব-জননী, বলো, তুমি কি চাও না—তোমার পাণ্ডবদের জয়?

কুন্তী। জয়? মা আমি! 'জয়ী হও' বলে,—কর্ব্বনা-কি আমি তাদের আশীর্ব্বাদ? না। তাদের জয়, তাদের জীবন, তাদের মঙ্গল আমি চাই! আমি কুন্তী, সন্তানের জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি, ভিক্ষে করতে পারি, সব সব পারি কর্ণ

কর্ণ। [রুদ্ধকণ্ঠে] কর্ণ! কিন্তু কর্ণের জন্যে, তার জননী তো তা পারেনি দেবী। জঠরে স্থান দিয়ে, তার জননী তো তাকে কোল দেয়নি। যাক্,—সে মা হয়তো পাণ্ডবজননীর মত নয়! তবু সে আমার মা, আমার স্বর্গ, আমার তপস্যা, আমার সব! কিন্তু—আমার অর্ঘ্যে তো তুমি তুষ্ট হওনি দেবী? অপেক্ষা করো! এই কবচকুণ্ডল,—আমার দেহ থেকে কেটে আমি তোমাকে দিচ্ছি! [ছুরী দিয়ে নিজের কবচকুণ্ডল কেটে ফেললেন] নাও, বুকের-রক্তে সিক্ত এই কবচ, আর এই কুণ্ডল, নাও জননী,—নাও,—আমি কর্ণ! [কবচ-কুণ্ডল কুন্তীর পদতলে রেখে দিলেন। [কুন্তী মূর্ত্তি ত্রস্তে সরে, পিছনের দরজার কাছে পিছিয়ে গেল।]

কুন্তী। কর্ণ! এ-অর্ঘ্য তোমার তো আমি চাইনি বৎস!

কর্ণ। বৎস! কেন এ স্নেহ-সম্ভাষণ? চাওনি? তবু বুকের এই রক্ত দেখে, কই, তোমার চোখ দিয়ে তো এক-ফোঁটাও জল পড়লো না? কর্ণ যে তোমার সন্তান নয়! যাও, তোমার সন্তানেরা নিশ্চিন্ত হয়ে যুদ্ধ করুক,—নির্ভয়ে যাও জননী!

কুন্তী। জননী! হ্যাঁ, আমি জননী। তাই, এ-অর্ঘ্য তোমার আমি নিতে পারলাম না কর্ণ। তবু সন্তানের জন্যে মায়ের যে নিষ্ঠুরতা, তা ক্ষমা করো বৎস! আমি হ্যাঁ, আমি মা,—মা!

[প্রস্থান]

কর্ণ। মা! ক্ষমা! হ্যাঁ ক্ষমা! তবু, তুমি যদি হতে আমার মা—!

[কর্ণ ফিরে বিছানায় কুঁকড়ে শুয়ে পড়লেন। প্রভাত। দরজায় উপস্থিত শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর পদতলে, কর্ণের অস্ত্র ও মণিখচিত কবচ-কুণ্ডল।]

কৃষ্ণ! কর্ণ।

কর্ণ। [মাথা তুলে] কে?

কৃষ্ণ। কাল যুদ্ধে, ভীষ্মপর্ব্ব শেষ হয়ে গেছে অঙ্গরাজ!

কর্ণ। ভীষ্মপর্ব্ব, যুদ্ধের আগেই তো শেষ করে রেখেছিলে কৃষ্ণ! [চারিদিকে চেয়ে] কিন্তু আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম!

কৃষ্ণ। তুমি কি, এই অস্ত্র আর কবচ-কুণ্ডলের কথা বলছো?

কর্ণ। ওগুলো তোমার পায়ের কাছে কেন কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। তোমার দেহ, রক্তে ভেসে গেছে কর্ণ। নাও, এগুলো তুলে রাখো।

কর্ণ। কৃষ্ণ,—এত ক্রুর তুমি যে, এই অবস্থাতেও কর্ণকে বিদ্রূপ করছো! কর্ণ কি দান করে, সে দান ফিরে নেয়?

কৃষ্ণ। কিন্তু এতো তোমার শেষ; তোমার মৃত্যু!

কর্ণ। সে মৃত্যু, যেদিন জন্মেছিলাম সেইদিনই নির্দ্দিষ্ট হয়ে গিছলো শ্রীকৃষ্ণ! তবু জানতে ইচ্ছে হয় কৃষ্ণ, যে মা স্নেহ থেকে আমাকে বঞ্চিত করলো, সে কি আমার মৃত্যুতেও চোখের জল ফেলবে না!

কৃষ্ণ। আমি এইমাত্র তার চোখের জল দেখে এসেছি কর্ণ, তোমার জন্যে,—সে পাণ্ডব-জননী কুন্তী!

কর্ণ। কুন্তী! আমার—আমার—[হাঁপাতে লাগলেন]।

কৃষ্ণ। [কর্ণের অসমাপ্ত বাক্য সমাপ্ত করে] মা। সে তোমার মা কর্ণ!

কর্ণ। মা! [মুখ-ঢেকে বিছানায় বসে পড়লেন]

কৃষ্ণ। সূর্য্য-অংশে কুন্তীর গর্ভে জন্ম তোমার, তুমি প্রথম পাণ্ডব। এবার পাণ্ডবপক্ষে অনায়াসে যোগ দিতে পার কর্ণ। কৌরবদের পরাজিত করে তুমি জ্যেষ্ঠ-পাণ্ডব, সিংহাসন গ্রহণও করতে পার।

কর্ণ। [মুখ তুলে] কর্ণ তা পারে কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। [কর্ণের কাছে এগিয়ে] কর্ণ পারে না অঙ্গরাজ?

কর্ণ। [উঠে এক মুহূর্ত্ত চেয়ে, পরে কবচ-কুণ্ডল ও অস্ত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে] না, কর্ণ দান করে-সে দান আর গ্রহণ করে না! ঐ কবচ-কুণ্ডল আর ঐ অস্ত্র তার সাক্ষী! কৌরবকে, কর্ণ তার যুদ্ধ-কৌশল দান করেছে। সে আর বিমুখ হতে পারে না!

কৃষ্ণ। মায়ের চোখের জল, তার উত্তরে— এই কি কর্ণের শেষ-কথা?

কর্ণ। শেষ-কথা, কর্ণ স্বপ্নেই নিবেদন করেছে কৃষ্ণ! এক-নারীকে সে দান করেছে তার ক্রোধ, অপমান, সব,—আর এক-নারীকে দিয়েছে তার অভিমান, তার ক্ষমা!

কৃষ্ণ। তবে আমাকেও বিমুখ কোরো না! তোমার অন্তরের-বেদনা দাও, আমাকে দান করো কর্ণ!

কর্ণ। [একবার কৃষ্ণের দিকে চাইলেন, পরে হঠাৎ হাঁটু-গেড়ে বসলেন] তার আগে প্রতীজ্ঞা করো,- আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে, আমার জন্ম-পরিচয় কেউ জানবে না।

কৃষ্ণ। শপথ করলাম কর্ণ!

কর্ণ। নাও, আমার অন্তরস্থ-বেদনা,—আমার শেষ-আহুতি গ্রহণ করো শ্রীকৃষ্ণ!

তৃতীয় অঙ্ক

[পাণ্ডব শিবিরের কক্ষ-সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ বারান্দা। বারান্দার দু'ধারে দুটী দেওয়াল ও উভয় দেওয়ালে একটী করে দরজা। একটী দরজা বন্ধ, আর একটী খোলা। বারান্দার পিছন দিকটা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। আকাশ। আকাশে অজস্র তারা ও বর্দ্ধিত আকারে চন্দ্র টল-টল করছে। বহুদূরে শৃগাল, কুকুর ইত্যাদির চীৎকার। আরও দূরে ক্রন্দন-ধ্বনি। নিকটে কোথাও স্তোত্র-পাঠ। উন্মুক্ত-বারান্দায় কতকগুলি বসবার আসন। মেঝেতে একরাশি ফুল ছড়িয়ে পড়ে আছে। দুঃশাসন একটী আসনে বসে। বিকর্ণ প্রবেশ করলেন দক্ষিণ দিকের উন্মুক্ত দরজা দিয়ে।

বিকর্ণ। কি? পাণ্ডব-শিবিরে তুই কেন দুঃশাসন।

দুঃশা। সারা কুরুক্ষেত্রে কোথাও একটু ঘুমোবার জায়গা নেই। একটু চোখ বুঁজেছি আর অম্নি চেঁচাতে সুরু করলি?

বিকর্ণ। আজ ঝগড়া করিসনে দুঃশাসন! এখন আমি যোদ্ধা। ইচ্ছে করলেই অস্ত্র ধরতে পারি।

দুঃশা। [লাফিয়ে উঠে] বটে। তাহলে শাস্ত্র-শাস্ত্র করে তোর পাগলামিটা সেরে গিয়েছে?

বিকর্ণ। শাস্ত্রের তুই কিচ্ছু বুঝিসনে। ধর্মের জন্যে সব করা যায়।

দুঃশা। হুঁ, বক্!

বিকর্ণ। আবার বক্!

দুঃশা। আলবৎ বক! কিন্তু, এখন তোর সঙ্গে ঝগড়া করবোনা বিকর্ণ। আমি এখন দূত।

বিকর্ণ। দূত! কার দূত?

দুঃশা। আমার।

বিকর্ণ। [অবাক হয়ে] তোর দূত তুই !

দুঃশা। [সক্রোধে] দূত হতে আমি ছাড়া আমার আর লোক কই !

বিকর্ণ। তোর মতলব কি দাদা ?

দুঃশা। অনেক তপস্যা করে আমি একটা অস্ত্র লাভ করেছি, বিকর্ণ ! পাণ্ডব শিবিরে এসেছি, আমার সব-চেয়ে বড় শত্রুর ওপর -সেই অস্ত্র পরীক্ষা করতে।

বিকর্ণ। দূত সেজে ! জানিস, এ শাস্ত্র-বহির্ভূত কাজ ?

দুঃশা। ও-সব তোর মত স্ত্রীলোকের কথা !

বিকর্ণ। [সক্রোধে] দাদা !

দুঃশা। চোপ !

বিকর্ণ। তুই তপস্যা করেছিস, এ আমি বিশ্বাস করিনে।

দুঃশা। নিশ্চয়ই করেছি।

বিকর্ণ। কখন করলি ? আমি তো আমার জন্মাবধি তোকে দেখছি।

দুঃশা। তোর জন্মানোর আগে।

বিকর্ণ। অবাক কথা ! কখন তপস্যা করলি তুই ?

দুঃশা ঃ প্রত্যেক রাত্রে নিদ্রার সময়।

বিকর্ণ। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ?

দুঃশা। আলবৎ ! যা' যুধিষ্ঠিরকে ডেকে আন্ ! আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি নে। সকাল হলেই আবার যুদ্ধ সুরু হবে ! রোজ রোজ যুদ্ধ— ভাল লাগে না।—যা !

বিকর্ণ। যুধিষ্ঠির এখন ঘুমুচ্ছে। কিন্তু তোর অস্ত্র কই ?

দুঃশা। যুধিষ্ঠিরকে জাগিয়ে আন্। তারপর বল্ছি।

বিকর্ণ। উঁ-হুঁ, তোকে বিশ্বাস করিনে। তুই আগে বল ?

দুঃশা। তবে শোন্। আমার অস্ত্র, কাতু-কুতু !

বিকর্ণ। [অবাক হয়ে] কাতু-কুতু !

দুঃশা। হ্যা,—দেবতা সেজে, যে সব মানুষ দিব্যি বক হয়ে বেড়াচ্ছে ; তাদের দেবত্ব নষ্ট করতে, ঐ আমার অস্ত্র।

বিকর্ণ। অ্যাঁ, কাতুকুতু !

দুঃশা। যা বল্‌ছি। নৈলে—[অগ্রসর হলেন]

বিকর্ণ। [পিছিয়ে] খবরদার দাদা ! আমি কিন্তু সত্যি, অস্ত্র-গ্রহণ করবো।

[যুধিষ্ঠির রুদ্ধ-দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন]

যুধি। তুমি অনেকক্ষণ বসে আছ দুঃশাসন !

দুঃশা। এতক্ষণ বসেই ছিলাম। কিন্তু, এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি মহারাজ।

বিকর্ণ। কথার যদি কোনও মানে হয় !

যুধি। তুমি আমার সাক্ষাৎ চেয়েছ। কিন্তু কি দৌত্য নিয়ে তুমি এসেছ, দুঃশাসন ?

দুঃশা। সন্ধির দৌত্য।

যুধি। [সাগ্রহে] সন্ধি ! দুর্যোধন তাহলে সন্ধি চায় ?

দুঃশা। তাই তো উচিত ! ভীষ্ম নেই, দ্রোণও হত। আর কর্ণ তো ক্রমাগত দুদিন যুদ্ধ করে, কিছুই করতে পারলো না। এখন সন্ধির প্রস্তাবটাই তো ভেবে দেখা উচিত !

যুধি। [আসন দেখিয়ে] বসো !

[দুঃশাসনের আসন গ্রহণ, যুধিষ্ঠিরেরও উপবেশন]

কি রকম সন্ধি দুঃশাসন ?

দুঃশা। যুদ্ধটা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলা !

যুধি। কি প্রস্তাবে ?

দুঃশা। এবার শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র ধরুন !

যুধি। [উঠে] শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে বিদ্রুপ করতে দুর্য্যোধন তোমাকে পাঠিয়েছে ? এরই নাম সন্ধি !

দুঃশা। [উঠে] দুর্য্যোধন নয়, প্রস্তাবটা আমার। যুদ্ধ শেষ হলেই তো সন্ধি হয়ে গেল। সুতরাং, যুদ্ধ শেষ হয়ে যাক !

যুধি। তুমি আমাকে উপহাস করছো !

দুঃশা। হ্যাঁ ! ছোটবেলা থেকে দুঃসাহসটা আমার একটু বেশী। তাই বাপ-মা আদর করে আমার নাম রেখেছিলেন, দুঃশাসন ! মহারাজ যুধিষ্ঠির তা জ্ঞাত আছেন !

বিকর্ণ। দাদা, ঠাট্টা ছেড়ে তোর যা বক্তব্য তাই বল্ !

দুঃশা। এতে ঠাট্টাটা কোথায় ? শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন না। কিন্তু ভীষ্মের যুদ্ধে, তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত অস্ত্র-ধারণ করতে হয়েছিল।

যুধি। কিন্তু তিনি ভীষ্মকে বধ করেন নি ?

দুঃশা। না, ভীষ্ম-বধ করেছে এই দুঃশাসন ! তাই অনুতপ্ত হয়ে আমি পাণ্ডব শিবিরে ছুটে এসেছি, সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে ! সন্ধির সর্ত্তে, আমি যুদ্ধ চাই।

যুধি। যুদ্ধ ! কার সঙ্গে যুদ্ধ চাও দুঃশাসন ?

দুঃশা। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে। প্রস্তুত হ'ন মহারাজ !

যুধি। তোমার অস্ত্র কই ?

দুঃশা। আছে।

বিকর্ণ। [অবাক হয়ে] কাতুকুতু ?

দুঃশা। চুপ !—আপনি প্রস্তুত ধর্ম্মরাজ ?

যুধি। তুমি রহস্য করছো ?

দুঃশা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটাও তো একটা রহস্য। ভীষ্মকে বধ করেছি আমি রহস্য করে। দ্রোণকে বধ করেছে একটা হাতি, রহস্য করে।

যুধি। রহস্য করে ?

দুঃশা। নিশ্চয়ই! সেই হাতির নাম ছিল, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থমার নাম। তাই হাতি বধ করে প্রচার করা হল, অশ্বত্থমা যুদ্ধে হত হয়েছে। দ্রোণ, পুত্র-শোকে অস্ত্র ত্যাগ করলো। তার চির শত্রু দ্রুপদ-নন্দন, তখন খড়্গাঘাতে তাকে বধ করলো। এটা রহস্য করে বধ করা নয় ?

যুধি। এখন তুমি আমার কাছে কি চাও বল ?

দুঃশা। বলেছিতো, প্রথম প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র ধরুন—। আর—

যুধি। তিনি তা ধরবেন না।

দুঃশা। তবে হাত গুটিয়ে নিন্ ? [যুধিষ্ঠির নীরব] বুঝেছি। তাও তিনি নেবেন না! আচ্ছা, এবার দ্বিতীয় প্রস্তাবে আপনার সঙ্গে আমার যুদ্ধ ? [যুধিষ্ঠির নীরব] বুঝেছি। তাও হবে না!

যুধি। পাণ্ডব-শিবিরে স্থির হয়েছে দুঃশাসন, কাল তোমার সঙ্গে ভীমের যুদ্ধ !

দুঃশা। ভীম! [একটু থেমে] সেই আমাদের শেষ-যুদ্ধ। হয় ভীম, নয় দুঃশাসন! সুতরাং, এবার তবে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি ?

যুধি। কি জানতে চাও, বলো দুঃশাসন !

দুঃশা। ভীম ও দুঃশাসনের মধ্যে যুদ্ধ হলে, আপনি কার মৃত্যু হলে খুসী হন ?

যুধি। [ক্ষণেক চেয়ে] আমি ধর্ম্মযুদ্ধ করছি।

দুঃশা। উত্তরটা স্পষ্ট না হলেও, বক্তব্যটা অস্পষ্ট নয়! শুনেছি ভীম প্রতিজ্ঞা করেছে, সে আমার বুক চিরে রক্তপান করবে; আর

দ্রৌপদী, সেই রক্তে ভিজিয়ে তার বেণী বাঁধবে! এ বিষয়ে, আপনার কি মত ?

যুধি। তাদের উভয়ের প্রতিজ্ঞা—তারাই বিচার করবে।

দুঃশা। অর্থাৎ, আপনার বিচার আপনি প্রকাশ করবেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠির, আপনি দ্রৌপদীর প্রতি অনুরক্ত ?

বিকর্ণ। [ক্রুদ্ধকণ্ঠে] দাদা !

যুধি। শান্ত হও বিকর্ণ। [দুঃশাসনকে] দ্রৌপদী আমাদের সহধর্ম্মিণী।

দুঃশা। তবে দ্রৌপদীর প্রতি আমার যে-দুর্ব্যবহারে অন্যান্য পাণ্ডব ক্রুদ্ধ, সে বিষয়ে আপনার কিছু কর্ত্তব্য নেই ?

যুধি। আমার কর্ত্তব্য এই ধর্ম্মযুদ্ধ।

দুঃশা। যুদ্ধ কি তবে প্রতিবিধানের জন্যে ?

যুধি। না দুঃশাসন, আত্মরক্ষার জন্যে !

দুঃশা। আত্মরক্ষার প্রয়োজন ?

যুধি। আত্মপ্রতিষ্ঠা।

দুঃশা। এ মনুষ্যত্ব, না দেবত্ব ?

যুধি। মনুষ্যত্ব।

দুঃশা। তবে দেবত্ব কি ?

যুধি। পূর্ণ-মনুষ্যত্বের আর একটী নাম !

দুঃশা। আমি পরাজিত হয়ে সন্ধি করলাম মহারাজ! কিন্তু কাল যুদ্ধে—ভীম জয়ী হবে না, জয়ী হব আমি। কারণ, আমিও ধর্ম্ম-যুদ্ধ করবো—আত্মরক্ষা। [ধীরে ধীরে প্রস্থান]।

বিকর্ণ। যত সব অশাস্ত্রীয় কথা ! [দুঃশাসনের পুনঃপ্রবেশ] কি আবার ফিরে এলি দাদা ?

দুঃশা। আমার শেষ-অস্ত্র ত্যাগ করবার পূর্ব্বে, যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সন্ধি হয়ে গেল। আমি শত্রুর সন্ধান পেয়েছি।

বিকর্ণ। অ্যাঁ, আমি! দ্যাখ দাদা,—আর আমি তোর ভাই নই!

দুঃশা। না। আগে ছিলি জ্যেঠা, এখন পাণ্ডব-পক্ষে যোগ দিয়ে হয়েছিস ঠাকুমা! যাঃ,—তোর সঙ্গে আবার শত্রুতা!—যে আমার শত্রু,—ঐ দ্যাখ সে আসছে! [বাইরের দিকে নির্দ্দেশ]

বিকর্ণ। [বাইরে শ্রীকৃষ্ণকে আসতে দেখে] অ্যাঁ, কৃষ্ণ?

দুঃশা। [ধমক দিয়ে] চোপ!

[শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করলেন]

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি কি ফিরে এলে, আমাকে দেখে দুঃশাসন?

দুঃশা। হ্যাঁ। তোমাকে দর্শন না করলে নাকি মুক্তি হয় না! মহারাজ শ্রীকৃষ্ণ! কাল যুদ্ধে, সারথীরূপে আপনার ভূমিকাটা কি?

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি নিজে কি অনুমান করো দুঃশাসন?

দুঃশা। কর্ণ বধ?

শ্রীকৃষ্ণ। [সহাস্যে] আশ্চর্য্য কি!

দুঃশা। আর দুঃশাসন বধ?

শ্রীকৃষ্ণ। অসম্ভব নয়! [উচ্চহাস্য]

দুঃশা। [সবিস্ময়ে] হাসছো! আর লুকিয়ে নয়, ত্রিভুবনকে জানিয়ে—অর্থাৎ প্রকাশ্যে! মহারাজ শ্রীকৃষ্ণ! দেবতা হাসলে তার দেবত্ব যায় না, অথচ দেবত্বলোভী মানুষ—হেসে ফেললেই তার দেবত্বের আর আশা থাকে না; এর কারণ কি?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি দেবতা নই, দেবত্বে আমার লোভও নেই!

[পুনরায় উচ্চহাস্য]

দুঃশা। বেপরোয়া হাসি। কৃষ্ণ! তুমি দেবতা হয়ে, মানুষ সেজে প্রাণ খুলে হাসছো; আর মানুষকে দেবত্বের লোভ দেখিয়ে, গম্ভীর করে মনে মনে কাঁদাচ্ছো। তুমি কি বক-ধার্ম্মিকের প্রপিতামহ?

শ্রীকৃষ্ণ। [হঠাৎ গম্ভীর হয়ে] দুঃশাসন, হয় তুমি আমার কাছে বর প্রার্থনা করো, নয় আমি প্রার্থনা করি; তুমি আমাকে বর দাও।

দুঃশা। [অবাক হয়ে] আমার অভাব নেই কৃষ্ণ। বর প্রার্থনা করতে হয়, বরং তুমিই করো।

শ্রীকৃষ্ণ। বেশ ভাল রকম চিন্তা করে উত্তর দাও দুঃশাসন!

দুঃশা। ও-সব যত বাজে চিন্তা করবার সময় আমার নেই!

শ্রীকৃষ্ণ। এর পরিণাম কিন্তু ভাল নাও হতে পারে—

দুঃশা। [বাধা দিয়ে] আমি তোমাকে চিনি। তোমার কাছ থেকে, অন্য পরিণাম আশা করা পাগলামি।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে তোমার মনের ঐ নিরুদ্বেগ-স্বাচ্ছন্দ্য,—ঐ পরিহাসশক্তি আমাকে দাও।

দুঃশা। [চম্‌কে] এই তোমার প্রার্থনা!

[সবিস্ময়ে চেয়ে, কয়েক মুহূর্ত্ত পরে]

জানো এর অর্থ কি?

শ্রীকৃষ্ণ। [দৃঢ়কণ্ঠে] আমার প্রার্থনা পূর্ণ করো দুঃশাসন।

দুঃশা। দিলাম। ধর্ম্মরাজ সাক্ষী, রাত্রি-শেষের প্রত্যেকটী নক্ষত্র সাক্ষী, আমার প্রাণভরা হাসি,—আমার আনন্দময় স্বাচ্ছন্দ্য,—শ্রীকৃষ্ণ, আমি তোমাকে দান করলাম।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি গ্রহণ করলাম দুঃশাসন! [মৃদুহাস্য]

দুঃশা। তোমার ঐ হাসির অর্থ আমি জানি কৃষ্ণ! প্রথম ভূমিষ্ঠ হয়ে, মাতৃক্রোড়ে চোখ মেলে যে আনন্দ দিয়ে আমি বিশ্ব-পৃথিবীকে গ্রহণ করেছিলাম; মনের যে স্বাচ্ছন্দ্যের বলে আমি দুর্ব্বার মৃত্যুকে অবহেলা করতাম, সেই আনন্দ—সেই আমার জীবন—তুমি বর চেয়ে নিয়ে হরণ করলে। বুঝলাম, কাল যুদ্ধে জয়ী হবে—দুঃশাসন নয়, ভীম।

শ্রীকৃষ্ণ। [অনুতাপের ভাণে প্রায় ব্যঙ্গের মত করে] আমি কি তবে, তোমার সমস্ত শক্তি হরণ করলাম দুঃশাসন?

দুঃশা। না,—ও নাম দিয়ে আমায় সম্বোধন কোরো না। শুধু শক্তি কেন, আমার ব্যক্তিত্বও তুমি হরণ করলে। আমার —আমার মানবতা কেড়ে নিয়ে, তুমি আমাকে দিলে দেবত্ব। তাই নেহাৎ মানুষের মত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে—আমি মিথ্যাচারী হতে পারলাম না!

শ্রীকৃষ্ণ। মানুষের দেবত্বে কি এত দুঃখ দুঃশাসন?

দুঃশা। আর দেবতার মনুষ্য-লালায কি এত আনন্দ কৃষ্ণ? কিন্তু, একি করলে তুমি! দুঃখেও নয়, ক্রোধেও নয়, এমন কি মৃত্যুর জন্যেও নয়, তবু এ কি নিদারুণ-বিষাদে দুটী চক্ষু আমার জলে ভরে আসছে! দেহের প্রত্যেকটী শিরা, আমার বিষণ্ণ নিস্তেজ হয়ে আসছে! এই প্রথম—পৃথিবীতে এই প্রথম আমার চোখে জল এল।

শ্রীকৃষ্ণ। [যেন সহানুভূতির সঙ্গে] এ-অবস্থা হবে জানলে, আমি তোমার সঙ্গে পরিহাস করতাম না।

দুঃশা। মানুষের সঙ্গে দেবতার পরিহাসের, এ-ছাড়া আর কোনও রূপ তো নেই!—না,—যাই, আমি যাই, যাই—আমি যাই কৃষ্ণ,

মহাশূন্যে—একটা দীর্ঘশ্বাসের মত মিলিয়ে যাই! আমি যাই, আমি যাই—

[দুর্ব্বল গতিতে অনিশ্চিত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে চলে গেলেন দুঃশাসন! শ্রীকৃষ্ণ উপরের দিকে চেয়ে রইলেন, হয়তো মহাশূন্যের মধ্যে কি খুঁজে দেখছিলেন - ঐরকম আরও কত পরিহাসের চিহ্ন!]

বিকর্ণ। এমন সব কথা, যার কোনও মানে হয় না। একেবারে দ্বিতীয় কর্ণ! কেবল, অহং দিয়ে ভরা! যত সব অশাস্ত্রীয় আচার!

[চলে গেলেন]

শ্রীকৃষ্ণ। রাত্রি এবার প্রভাত হতে চলেছে যুধিষ্ঠির! [কাছে গিয়ে] তন্ময় হয়ে কি ভাবছো মহারাজ?

যুধি। সুত-পুত্র কর্ণের শক্তি! কবচ-কুণ্ডল-বিহীন, দিব্য-অস্ত্র সবই বিস্মৃত হয়ে, নেহাৎই সাধারণ অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করছে। স্বয়ং অর্জ্জুনের মত ত্রিভুবন-জয়ী অদ্বিতীয় বীরও, তাকে পরাস্ত করতে পারছে না। একি রহস্য কৃষ্ণ?

শ্রীকৃষ্ণ। এ রহস্যের কথা, কর্ণতো স্বয়ং পাণ্ডবশিবিরে আসছেন, তাঁকেই জিজ্ঞাসা কোরো।

যুধি। [স্তম্ভিত হয়ে] কর্ণ! দাম্ভিক, পাণ্ডবদ্বেষী কর্ণ আসছে পাণ্ডব-শিবিরে।

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ, রাত্রি প্রভাত হবার আগেই। আজ যুদ্ধের পর, তার এই সঙ্কল্প কর্ণ আমাকে জানিয়েছিল মহারাজ।

[অর্জ্জুনের প্রবেশ]

যুধি। ধনঞ্জয়, শুনেছ সংবাদ? কর্ণ, অঙ্গরাজ কর্ণ আসছেন পাণ্ডব শিবিরে?

অর্জ্জুন। [চমকিত হয়ে] ও, তবে আমার প্রতিজ্ঞার-সংবাদ গুপ্তচর মুখে সে জানতে পেরেছে মহারাজ। আজ যুদ্ধের পর, দ্রৌপদী সমক্ষে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—

[কর্ণ প্রবেশ করলেন]

কর্ণ। কি প্রতিজ্ঞা করেছ সব্যসাচী ?

অর্জ্জুন। সূত-পুত্র অঙ্গরাজ ! কাল যুদ্ধে—হয় অর্জ্জুন,—নয় কর্ণ, পৃথিবীতে শুধু একজন বেঁচে থাকবে।

কর্ণ। [স্মিতবদনে] এখনও প্রভাত হয়নি ! তোমার সে ভীষণ-প্রতিজ্ঞা পরীক্ষা করবার এখন বিলম্ব আছে মহাবীর।

অর্জ্জুন ! সব্যসাচী অর্জ্জুনকে, তুমি বিদ্রূপ করছ কর্ণ ?

কর্ণ। [একদৃষ্টিতে অর্জ্জুনের দিকে চেয়ে] কর্ণের মতই ! সেই শক্তি, সেই স্পর্দ্ধা,—সেই দুর্জ্জয় তেজ ! অর্জ্জুন, আজ সত্যিই তুমি অপূর্ব্ব যুদ্ধ করেছ !

অর্জ্জুন। স্পর্দ্ধা !– কর্ণ, তোমার কথাবার্ত্তায় যেন গুরুজনের মত সুর। ত্রিভুবন-জয়ী অর্জ্জুন, নাবালক নয় অঙ্গরাজ ;—আর যুদ্ধক্ষেত্র নয়, সূতপুত্রের সূতিকাগৃহ।

কর্ণ। সুন্দর ! সব্যসাচী ! শুধু ত্রিভুবনজয়ী তুমি নও ! তার চেয়েও বড় তুমি, তুমি কর্ণ-বিজয়ী বীর ! তুমি জানো না পাণ্ডব, তোমার পরিচয়ের মধ্য দিয়ে –যে অস্ত্র তোমার তূণে স্বয়ং বিধাতা তুলে দিয়েছে, কর্ণকে জয় করতে কি অপরিসীম শক্তি তার !

অর্জ্জুন। অসহ্য ! [যুধিষ্ঠিরকে] এ বিদ্রূপ, এ স্পর্দ্ধা, অসহ্য মহারাজ ! আমি কাল—কাল এর উত্তর দেব !

কর্ণ। দিও। [অর্জ্জুনের দীপ্ত-চক্ষু দুটীর দিকে চেয়ে] সুন্দর !—

যাও বীর,—আমি অতিথি, কোনও পাত্র করে আমাকে একটু জল এনে দাও।

অর্জ্জুন। [স্তম্ভিত হয়ে] জল! এর অর্থ কি মহারাজ! তুমি যদি সন্ধির উদ্দেশ্যে এসে থাকো,— মনে রেখো, সন্ধি হলেও, আমি তোমাকে দ্বৈরথ-যুদ্ধে আহ্বান করবো! না! পৃথিবীতে তোমার অস্তিত্ব আমার কাছে অসহ্য! তাই হয় তুমি, নয় আমি, একজনকে বিদায় নিতে হবে।

কর্ণ। [স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে চেয়ে] আগে আমাকে জল এনে দাও অর্জ্জুন, আমি অতিথি।

অর্জ্জুন। অতিথি! হীনকুলোদ্ভব, পরিচয়হীন, সূতগৃহে পালিত তুমি! তোমার হীন-উদ্দেশ্য বোঝা, আমার পক্ষে অসম্ভব। তবু তুমি অতিথি হয়ে জল চেয়েছ,—আমি এনে দিচ্ছি কর্ণ!

শ্রীকৃষ্ণ : দাঁড়াও অর্জ্জুন,—জলের জন্য পাত্রটা আমি নিজে বেছে দেব।

[শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রস্থান]

যুধি। পাণ্ডব শিবিরে তুমি এসেছ—এর কারণ তুমিই জানো অঙ্গরাজ! —[একমুহূর্ত্ত পরে] কিন্তু তুমি কি সত্যই তৃষ্ণার্ত্ত?

কর্ণ। [নিঃশব্দে হেসে] তৃষ্ণার্ত্ত!—[বাইরের দিকে চেয়ে] রাত্রি বড় শীঘ্র প্রভাত হয়ে আসছে। [যুধিষ্ঠিরের দিকে ফিরে] মহারাজ যুধিষ্ঠির! আজ মনে-প্রাণে সমস্ত অন্তর দিয়ে তৃষ্ণার্ত্ত না হলে, তোমাদের অতিথি হবার সুযোগ আজ আমার হত না! কেন অতি শৈশব থেকে পায়নি এ অপূর্ব্ব তৃষ্ণা! কেন এই তৃষ্ণা আকণ্ঠ-পান করে, চিরজীবন পিপাসিত হয়ে কাটাতে পারি নি! আমার এই দেহের প্রত্যেকটা শিরা-উপশিরায়, প্রত্যেক রক্তকণায়, কেন খেলে যায়নি সারাজীবন ধরে—প্রতি মুহূর্ত্তে, এই তৃষ্ণার

বিদ্যুৎ। কৌন্তেয়,—তোমার কাছে এই অপূর্ব্ব-তৃষ্ণা নিয়ে আমি আজ তোমাদের অতিথি।

যুধি। [স্থিরচিত্তে] অতিথিকে তুষ্ট করতে, পাণ্ডবেরা বিমুখ হয় না কর্ণ।

কর্ণ। পাণ্ডবেরা!–হ্যাঁ, কিন্তু শুধু পঞ্চ-পাণ্ডব! কর্ণও কোনও দিন, কোনও অতিথিকে বিমুখ করেনি। তোমার আর তিনটি ভাই, তারা কোথায় যুধিষ্ঠির?

যুধি। ভীম, নকুল, সহদেব, –এখনও ঘুমুচ্ছে মহারাজ।

কর্ণ। না। তবে তাদের ঘুম ভাঙিয়ে কষ্ট দেব না! কিন্তু—হ্যাঁ, —শোনো মহারাজ, আমি তবে শুধু -সেই নিদ্রিত ভাই তিনটিকে চুম্বন করে আসবো।

যুধি। [বিস্মিত হয়ে] অঙ্গরাজ! তুমি—

কর্ণ। [বাধা দিয়ে] শত্রু! হ্যাঁ। কিন্তু, এখন আমি তোমাদের অতিথি। আর তারা তো এখন ঘুমিয়ে আছে যুধিষ্ঠির! সূতপুত্র কর্ণের স্পর্শ, তারা বুঝতে পারবে না!

যুধি। তারা অঙ্গরাজকে সর্ব্বান্তরকণে ঘৃণা করে।

কর্ণ। [নীরবে হেসে] সূত-পুত্র বলে! কিন্তু, নিদ্রিত-অবস্থায় তারা আমাকে চিনতে পারবে না। আমি শুধু, আমার চুম্বন দিয়ে একটীবার স্পর্শ করবো। আমি দেখবো যুধিষ্ঠির, নিদ্রিত-পাণ্ডব কর্ণকে চোখে না দেখে—তার স্পর্শে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে কি না! [হঠাৎ বাইরে চেয়ে] ওঃ—রাত্রি বড় শীঘ্র প্রভাত হয়ে আসছে।

যুধি। তারা যখন ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠবে মহারাজ, তোমার এই হীন-কাহিনী শুনে, তোমাকে ধিক্কার দেবে, আরও ঘৃণা করবে কর্ণ!

কর্ণ। আমি বিশ্বাস করিনে। কিন্তু, অতিথিকে তুষ্ট করো ধর্ম্মরাজ!

[অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের প্রবেশ। অর্জ্জুনের হাতে
স্বর্ণ-নির্ম্মিত পাত্রে—পানীয়-জল।]

অর্জ্জুন। এই নাও অঙ্গরাজ।

কর্ণ। [জলশুদ্ধ পাত্র হাতে করে] সোনার-তৈরী পাত্রটা নষ্ট করলে কৃষ্ণ! [পান করে অর্জ্জুনকে] আমি তৃপ্ত হলাম ধনঞ্জয়! [পাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে] আমি পরিচয়হীন কর্ণ।

যুধি। এবার চলো অঙ্গরাজ, তারা জেগে উঠলে অনর্থ হতে পারে!

কর্ণ। একটু অপেক্ষা করো ধর্ম্মরাজ! [অর্জ্জুনকে] অর্জ্জুন, তুমি সব্যসাচী। তোমার একটা হাত, আমার হাতের ওপর রাখো।

অর্জ্জুন। [যুধিষ্ঠিরকে] মহারাজ! এ অপমানও সহ্য করতে হবে?

যুধি। অঙ্গরাজ দীন-অতিথির মত পাণ্ডব-শিবিরে এসেছেন ধনঞ্জয়! অতিথির সেবায়, কোনও কার্য্যই অপমানকর নয় অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন। [দুই হাত প্রসারিত করে অসন্তুষ্ট চিত্তে] নাও—

কর্ণ। [তৎক্ষণাৎ পিছিয়ে] আমাকে প্রলুব্ধ কোরো না অর্জ্জুন! শুধু তোমার ডান-হাতখানি আমাকে দাও।

অর্জ্জুন। [সেই রকম অসন্তুষ্ট চিত্তে] বেশ, এই নাও, তুষ্ট হও অঙ্গরাজ!—[ডান হাতখানি এগিয়ে দিলেন।]

[কর্ণ নিজের বাম হাতের ওপর—অর্জ্জুনের ডান হাতখানি রেখে—
অর্জ্জুনের হাতখানি ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন,
অর্জ্জুন শিউরে উঠলেন]

কর্ণ। [প্রায় অস্ফুট-কণ্ঠে] কৌন্তেয়, তুমি শিউরে উঠলে! শিউরে উঠলে কুন্তীর সন্তান! আমার হাতের চেয়ে, তোমার হাত অনেক উষ্ণ! অপূর্ব্ব সুন্দর! [থেমে, নীরবে একটু হেসে]

কাল শত্রুর ওপর, এই হাতেই তোমার শেষ-তীরটী ছুঁড়ো সব্যসাচী !

অর্জ্জুন। [ত্রস্তে হাত টেনে নিয়ে] সেটী তোমার মৃত্যুবাণ,—তুমি আমার শত্রু কর্ণ।

কর্ণ। [অস্ফুট-কণ্ঠে] বুঝি ভুলে গিছলে অর্জ্জুন ! [উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে ক্ষণেক নির্বাক। অবশেষে অর্জ্জন ভ্রুকুটী করে ফিরে দাঁড়ালেন।]—আমাকে বধ করতে তীর কেন, তোমার ঐ বঙ্কিম ভ্রু-ভঙ্গিটীই যথেষ্ট ! [যুধিষ্ঠিরকে] চলো ধর্ম্মরাজ !

[যুধিষ্ঠির-সহ প্রস্থান]

অর্জ্জুন। [কম্পিত-কণ্ঠে] ঐ হীন-বংশোদ্ভূত রাধেয় কর্ণ আজ কি উন্মাদ হয়ে উঠেছে কৃষ্ণ ?

কৃষ্ণ। ঐ ওর নিয়তি অর্জ্জুন। নৈলে কাল কর্ণার্জ্জুন যুদ্ধে, মৃত্যু হত সব্যসাচী অর্জ্জুনের। তোমাকে স্পর্শ করে, সে তোমার মৃত্যুটুকু মুছে নিয়ে গেল পাণ্ডব।

অর্জ্জুন। স্পর্শ করে ! ওর স্পর্শে আমি আত্মহারা হয়ে গিছলাম জনার্দ্দন। মনে হল, ভীষ্ম কি দ্রোণ-বধের পর—স্বযং যুধিষ্ঠির আমাকে স্পর্শ করে সমাদর কবছেন।

[শ্রীকৃষ্ণ শুধু মৃদু হাসলেন]

আমি কর্ণকে ঘৃণা করি। এ পৃথিবীতে কর্ণ আর অর্জ্জুন, তুজনের বেঁচে থাকা অসম্ভব। কাল যুদ্ধে যদি আমার মৃত্যুও হয় কৃষ্ণ, আমার আত্মা শান্তি লাভ করবে।

শ্রীকৃষ্ণ। পাণ্ডবদ্বেষী কর্ণকে ঘৃণা করা, তোমার পক্ষে—অস্বাভাবিক নয় ! কিন্তু এত জ্বালা তোমার ধনঞ্জয় যে, নিজের মৃত্যুও কামনা করো ?

অর্জ্জুন। করি।—তবে শোনো কৃষ্ণ। কর্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে, আমার

মনের মধ্যে মুহূর্ত্তে কি যেন ঘটে যায়। মনে হয়,—ছুটে গিয়ে পৃথিবী ভুলে প্রতি রোম-কূপ দিয়ে তাকে আলিঙ্গন করি। ঐ সূতপুত্র, ঐ পরিচয়হীন,—হীন, দাম্ভিক কর্ণকে। একমাত্র গুরুজন ছাড়া কারও কাছে আমি মাথা নত করিনে। মনে হয়, মাথা নত করে, আমি তাকে প্রণাম করি। তাই কর্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে—আমি উত্তেজিত হয়ে উঠি,—প্রাণপণে কটুক্তি করি তাকে।—তার জন্ম-রহস্য নিয়ে অপমান করি!—শ্রীকৃষ্ণ, এ রকম অদ্ভুত-শত্রু পৃথিবীতে কারও নেই।

শ্রীকৃষ্ণ। কৌন্তেয়, কর্ণ সম্বন্ধে তোমার রীতিমত দৌর্ব্বল্য আছে। যুদ্ধের সময় এ-কথা শুনলে, যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই সুখী হবে না।

অর্জ্জুন। তবে শোনো জনার্দ্দন, সে দৌর্ব্বল্য যুধিষ্ঠিরেরও আছে।

কৃষ্ণ। অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন। হ্যাঁ, অর্জ্জুন তা লক্ষ্য করেছে। - কর্ণের শত্রুতায় তিনি ক্রুদ্ধ হন না, ব্যথিতও হন না,--শুধু বিস্মিত হন। মনে হয়, কর্ণকে তিনি মনে মনে বন্ধুরূপে পেতে অভিলাষ করেন,—হয়তো তাকে শ্রদ্ধাও করেন।

কৃষ্ণ। চমৎকার! পাণ্ডব-জননী কুন্তী যদি এই সব শোনেন, তবে এই মুহূর্ত্তে জয়ের-আশা ত্যাগ করে বনবাসের আয়োজন করবেন।

অর্জ্জুন। শ্রীকৃষ্ণ! কর্ণ সম্বন্ধে দৌর্ব্বল্য, স্বয়ং পাণ্ডবজননীরই বেশী।

কৃষ্ণ। [যেন হতাশ হয়ে] বেশী! ব্যস্!—তবে? কিন্তু!—না, একি সম্ভব ধনঞ্জয়?

অর্জ্জুন। তুমি কি বল্‌তে চাও, তুমি কিছুই জানোনা জনার্দ্দন? আমি লক্ষ্য করেছি,—কর্ণের জন্ম সম্বন্ধে, কি কর্ণের চরিত্র নিয়ে কোনও আলোচনা হলে, মা তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করেছেন। পথ

দিযে কর্ণের রথ আসছে শুনলে, ছুটে গিযে জানলায় দাঁড়িয়েছেন। প্রভাতে সূর্য্য-স্তব করবার সময়, অনেক সময় ভুলে কর্ণের নাম উচ্চারণ করেছেন। না। কর্ণ আর কর্ণ, এই কর্ণই আমাকে উন্মাদ করবে। শ্রীকৃষ্ণ। কর্ণের পরিচয় কি তুমি কিছুই জান না?

কৃষ্ণ। সে কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করছে। সুতরাং, তার পরিচয়ে সে তোমাদের শত্রু।

অর্জ্জুন। না, আমি তার বাপ-মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করছি।

কৃষ্ণ। বাপ-মায়ের ব্যাপার, সব মানুষেরই এক পরিচয় অর্জ্জুন। প্রত্যেকেরই—ঐ একটা বাপ, আর একটা মা। আর সে সেই উভয়ের সন্তান।

অর্জ্জুন। জনার্দ্দন। কাল যুদ্ধ। হয়তো সে যুদ্ধে, অর্জ্জুন নাও জীবিত থাকতে পারে। আজ সরল ভাবে আমার কথার উত্তর দাও কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ। তবে কর্ণের জন্ম-পরিচয়ের কথা, কাল প্রভাত হলে তুমি সূর্য্যকে শুধিও অর্জ্জুন। আমি অক্ষম। ঐ তিনি আস্‌ছেন। যাও, তুমি বিশ্রাম করো ধনঞ্জয়। রাত্রি আর বেশী নেই।

অর্জ্জুন। রাত্রি এই মুহূর্ত্তে প্রভাত হলে, আমি সুখী হতাম কৃষ্ণ।

[প্রস্থান।

প্রায় পরক্ষণেই কর্ণের প্রবেশ]

কর্ণ। না, রাত্রি বড় শীঘ্র প্রভাত হয়ে আসছে।—তোমার কি বিশ্বাস যুধিষ্ঠির, ওরা যখন জেগে উঠে শুনবে, আমি ওদের শিরচুম্বন করেছি—ওদের মন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠবে?

যুধি। আমি তোমার জন্যে দুঃখিত অঙ্গরাজ।

কর্ণ। আমি কিন্তু নিজের জন্যে খুব দুঃখিত হতে পারছিনে। আমার স্পর্শে, মনে হল নিদ্রিত-ভীম যেন আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো!

আর নকুল সহদেব,—তারা শুধু নিদ্রাতুর হয়ে, নির্লিপ্তভাবে আমার চুম্বন গ্রহণ করলো! বলতে পারো ধর্ম্মরাজ, তারা কুন্তীপুত্র নয় বলেই কি—তাদের এ নির্লিপ্ততা?

যুধি। আমি তাদের বিমাতৃ-সন্তান বলে মনে করিনে কর্ণ! কিন্তু তুমি অতিথি, বলো আর কি তোমার প্রার্থনা?

কর্ণ। প্রার্থনা! না—আকাঙ্খা! হ্যাঁ, আর একটী আকাঙ্খা আছে। তুমি আত্মজয়ী, কর্ম্মব্রতী পুরুষ। আমি তোমাকে আলিঙ্গন করবো যুধিষ্ঠির।

যুধি। [অগ্রসর হয়ে] তুমি তুষ্ট হও অঙ্গরাজ! [আলিঙ্গন]

কর্ণ। তোমার সর্ব্ব-শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো পাণ্ডব।

যুধি। [ঈষৎ বিচলিত হয়ে] তোমার মনের কথা, তুমি জানো কর্ণ। কিন্তু কেন জানিনে এক এক সময় মনে হয়, তুমি শত্রু নও, পাণ্ডবদের অতি আপনার কেউ! তুমি আঘাত করো,—কিন্তু সে আঘাতের দুঃখ, যেন তোমারই লাগে বেশী! কর্ণ! তুমি পাণ্ডব-পক্ষে থাকলে, আমি সুখী হতাম।

কর্ণ। [হঠাৎ চঞ্চল হয়ে] তুমি কাপুরুষ যুধিষ্ঠির! পাণ্ডবদের লজ্জা! তাই স্তোকবাক্যে ভুলোতে, শত্রুর স্তব করছো। মূর্খ ভীম, আর শিশু সব্যসাচী ছাড়া, তোমাদের মধ্যে পুরুষ কেউ নেই। তাই দুর্য্যোধনের কাছে, তোমাদের এত অপমান আর লাঞ্ছনা!

যুধি। তোমার দুর্ব্বাক্য আমি অনেক শুনেছি কর্ণ,—অনেকবার। প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে, তোমার সে জ্বালা—ঈর্ষার নয়,—পাণ্ডবদের গৌরবহানির কল্পিত-আশঙ্কায়। তাই, আমি তোমাকে প্রত্যেকবারই ক্ষমা করেছি কর্ণ!

কর্ণ—[স্তম্ভিত হয়ে] যুধিষ্ঠির! [হঠাৎ এগিয়ে] আমি—[থেমে]

না—[অন্যদিকে ফিরে] সেই ভাল ! পৃথিবী জানে, প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত শুধু পাঁচটাই পাণ্ডব ! তাই, - শুধু তাই থাক্ ইতিহাসে চিরসত্য হয়ে ! রাত্রি বড় শীঘ্র প্রভাত হয়ে আসছে। না ! এ হয় না, এ হবে না ! [হঠাৎ ফিরে শ্রীকৃষ্ণকে] কৃষ্ণ, আমার আতিথ্যে যুধিষ্ঠিরের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আমি এবার তাকে বিদায় দিচ্ছি !

কৃষ্ণ। [যুধিষ্ঠিরকে] কর্ণ বোধ হয় আরও কিছুক্ষণ থাকবেন। তুমি এবার বিশ্রাম করো মহারাজ ! আমি স্বয়ং, কর্ণের কাছে উপস্থিত থাকছি।

যুধি। তবে স্মরণ রেখো অঙ্গরাজ, অর্জ্জুনের সঙ্গে তোমার যুদ্ধ—

কর্ণ। [বাধা দিয়ে] কাল।

যুধি। [হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে] হ্যাঁ, কাল। [প্রস্থান]

কৃষ্ণ। কর্ণ, তুমি কি আর কারও সাক্ষাৎ চাও ?

কর্ণ। তোমার কি মনে হয় কৃষ্ণ ?

কৃষ্ণ। দ্রৌপদী আর কুন্তী শেষ-রাত্রে দেবপূজায় যায়।

কর্ণ। প্রত্যহ ?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ। পাণ্ডব-প্রিয়া দ্রৌপদী এই পথ দিয়েই যায়।

কর্ণ। [মাথা নেড়ে] না।

কৃষ্ণ। তবে কুন্তী ? পাণ্ডবজননীও যায়···এই পথ দিয়েই কর্ণ ?

কর্ণ। [সাগ্রহে ধীরকণ্ঠে] প্রভাতের পূর্ব্বে ?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ ! ঐ দ্রৌপদীর-পায়ের নূপুরের শব্দ কর্ণ ! আমাকে তোমার কাছে দেখলে, সে বিচলিত হবে। আমি পার্শ্বকক্ষে রইলাম।

[প্রস্থান।

কর্ণ গিয়ে আসনে বসলেন। একাকী। যেন অচঞ্চল

একটী প্রভাত, শেষ রাত্রির শেষ মূহূর্ত্তটীর জন্য অপেক্ষা করছেন—রাত্রিশেষের স্তব্ধ অন্ধকার ছায়ায়। নূপুর-ধ্বনি এগিয়ে এল। সহসা আকাশে একখণ্ড-মেঘ এসে যেন রাত্রির ছায়াটাকে আরও গভীর করে দিল। সেই মেঘের-ছায়ায় কর্ণের মূর্ত্তি অস্পষ্ট হয়ে গেল। দ্রৌপদী প্রবেশ করে থামলেন, নতমুখী হয়ে নিজের নূপুর ঠিক করে নিয়ে মুখ তুলে চাইলেন, দৃষ্টি পড়লো উপবিষ্ট-কর্ণের অস্পষ্ট-মূর্ত্তির দিকে। চমকে বিস্ময়ে ও ভয়-বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।]

দ্রৌপদী। [কয়েক মুহূর্ত্ত পরে] কে! কে তুমি?

[কর্ণ ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, পিছিয়ে গেলেন দ্রৌপদী, নিঃসন্দেহ হলেন যেন- এ, কর্ণেরই ছায়ামূর্ত্তি।]

তুমি! সেই স্বপ্ন তুমি,—নিদ্রার পথে এসে, প্রায়ই বিরক্ত করো আমায়। তাই তোমার এত স্পর্দ্ধা আজ, নিদ্রা থেকেও উঠে এসেছ—আমার জাগ্রত-অবস্থায় আমাকে দেখা দিতে!

কর্ণ। [পাষাণবৎ দাঁড়িয়ে] পাণ্ডব-প্রিয়া! পরিচয়হীন সেই সূত-পুত্র তোমার সম্মুখে। তাকে দেখে, তুমি এত ক্রুদ্ধ হও কেন কৃষ্ণা?

দ্রৌপদী। আবার? আবার সেই এক প্রশ্ন? নিদ্রার সুযোগে প্রায়ই তোমার এই হীন-আক্রমণ! মূর্খ আমি, যদি ধনঞ্জয়কে বলতাম, তার দিব্য-অস্ত্র দিয়ে—ঐ ছায়ামূর্ত্তি নিমেষে ছিন্নভিন্ন করে দিত। যাও—চলে যাও—!

কর্ণ। আমি তো তোমার কোনও ক্ষতি করিনি, তবে কেন এত ঘৃণা করো আমায় কৃষ্ণা?

দ্রৌপদী। ঘৃণা! ঐ এক কথা, একশ'বার তোমাকে বলেছি! পৃথিবীর কোনও মানুষকে, দ্রুপদনন্দিনী এত ঘৃণা করে না! আর কি ক্ষতি তুমি আমার করেছ, তা জানো রাধেয়? নীচ-কুলোদ্ভব হয়ে, কি অধিকারে—তুমি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় প্রবেশ করেছিলে? কোন স্পর্দ্ধায়—হীন সূতপালিত রাধেয় হয়ে, দ্রুপদ-নন্দিনীকে অভিলাষ করেছিলে? এতই যদি তোমার শৌর্য্য, এতই যদি তোমার প্রতিভা, দীর্ঘ তেজকায়-পুরুষ বলে এতই যদি তোমার অহঙ্কার, তবে কেন তুমি পরিচয়হীন হয়ে একটা সামান্য সূতগৃহে রাধার-ক্রোড়ে পালিত হয়েছ? ভীষ্মের মত যদি তুমি ক্ষাত্র, দ্রোণের মত যদি বীর, অর্জ্জুনের মত যদি তুমি বিশ্বজয়ী, তবে কেন তোমার এ হীন-ইতিহাস? যাও,—চলে যাও—তুমি, যাও।

কর্ণ। সেই স্বয়ম্বর-সভার কথা, তুমি আজও ভুলতে পারনি কৃষ্ণা?

দ্রৌপদী। না। দুষ্টগ্রহের মত সেদিন তুমি প্রবেশ করেছিলে! কিন্তু কোন স্পর্দ্ধায় বারবার তুমি আমাকে—কৃষ্ণা বলে ডাক? —হীন,—সূতপুত্র কর্ণ! জানো? পঞ্চ-পাণ্ডবের নারী আমি—দ্রুপদ-নন্দিনী, দ্রৌপদী!

কর্ণ। নারী! [অন্যদিকে চেয়ে] হ্যাঁ, ঈশ্বরের অপূর্ব্ব কল্পনা তুমি, পুরুষের স্পর্দ্ধাকে ধূলোয় মিশিয়ে দিতে সেই শক্তি তুমি, সৃষ্টির বৈচিত্র্যের মধ্যে একটীমাত্র যোগসূত্র,—যার পরিবর্ত্তন নেই, আরম্ভ নেই, শেষ নেই! [মাত্র মুখখানি ফিরিয়ে] কর্ণকে গর্ভে ধারণ করেছ তুমি, ত্যাগ করেছ তুমি,—আবার লুব্ধ-স্নেহে পালন করেছ তুমি!

দ্রৌপদী। আমি! [বিস্ফারিত চোখে চেয়ে, পিছিয়ে] কর্ণকে!

কর্ণ। [স্থির দাঁড়িয়ে] হ্যাঁ তুমি নারী! প্রতিদিনের স্নেহ দিয়ে, শক্তি দিয়ে,--তিলে তিলে শিশু-কর্ণকে যৌবন দিয়েছ তুমি। লক্ষ্যভেদ সভায়, কর্ণের পদক্ষেপে স্নিগ্ধ স্মিতহাস্য দিয়ে-তার স্বপ্নরাজ্য রচনা করেছ তুমি। ঘৃণায়-বিদ্রূপে-অপমানে তাকে রক্তাক্ত করেছ—সেও তুমি। কিন্তু নিশ্চিন্ত হও কৃষ্ণা, স্বপ্নের মতই, শুধু রাত্রির অন্ধকারেই কর্ণের অস্তিত্ব, কাল রাত্রি থেকে—এ দুঃস্বপ্ন তোমার কেটে যাবে।

দ্রৌপদী। ধিক্! দুর্বল! এত দুর্বল! পুরুষ হয়ে, নারীর তিরস্কারে আত্মসমর্পণ করে! হীন সূতপুত্র বলে, আমি তোমাকে ঘৃণা করিনি; আমি ঘৃণা করেছি—ক্ষাত্রধর্মী বীর হয়েও, তোমার ভীরুতার জন্যে। স্বয়ম্বর-সভায় দ্রৌপদীর একটী আপত্তি—সভাস্থ সকলের মূঢ়-আস্ফালন—তোমাকে স্তব্ধ করে দিল! তুমি কাপুরুষের মত, সভা ছেড়ে মাথা নীচু করে এলে! অথচ, তোমার ধনুর্ব্বাণ তোমার হাতেই ছিল তখন. অভেদ্য কবচকুণ্ডল তাও নাকি ছিল তোমার? বীর-পুরুষের মত যদি স্পর্দ্ধা করে সভায় ঢুকেছিলে, ভীরু নারীর মত—বেরিয়ে এসেছিলে কেন? যাও কাপুরুষ, পুরুষের বেশে—ঐ-নারীর ছায়া আমার অসহ্য!

কর্ণ। বুঝেছি দ্রুপদনন্দিনী, অজ্ঞাতকুলশীল কর্ণের সেই দীন-স্পর্দ্ধা তুমি আজও ক্ষমা করনি;—ঘৃণায় ভোলোনি, সেদিনের তার সেই ব্যর্থ তপস্যা? কৃষ্ণা, আমার সব অপরাধের জন্যে—আমি মার্জনা চাইছি—

দ্রৌপদী। স্তব্ধ হও সূতপুত্র! মার্জনা! ক্ষত্রিয়-নারীর স্নেহে মানুষ হলে, আমি তোমার মুখে অন্য কথা শুনতাম। মূর্খ দুর্বল পুরুষ, তুমি যদি পাণ্ডব হতে,—আমি এই-মুহূর্ত্তেই চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিতাম।

[কৃষ্ণা ঘৃণাভরে ফিরে দাঁড়ালেন। কুন্তী প্রবেশ করেছেন।]

কুন্তী। কৃষ্ণা, তুমি কাকে ভৎর্সনা করছো মা ?

দ্রৌপদী। [ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে] আমি বিভীষিকা দেখছি মা! নিদ্রা আমাকে পীড়ন করে, দুঃস্বপ্ন, -আজ জেগেও সেই দুঃস্বপ্ন দেখছি !

কুন্তী। [সম্পূর্ণ দ্রৌপদীর প্রতিই লক্ষ্য] কি দুঃস্বপ্ন দ্রৌপদী ? যুদ্ধ-সম্বন্ধে কিছু ?

দ্রৌপদী। [চমকে কুন্তীকে ছেড়ে] অঁ্যা ! যুদ্ধ ! হঁ্যা যুদ্ধেরই স্বপ্ন মা ! বোধ হয়, স্বপ্ন দেখছিলাম—কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবেরা পরাজিত হয়েছেন !—কিন্তু এতো একেবারেই অসম্ভব মা ?

কুন্তী। হ্যা অসম্ভব। পাণ্ডবদের যে পরাজিত করতে পারতো, সে আজ স্বেচ্ছায় পরাজয় বরণ করে নিয়েছে ! মা, শুধু সেই পারতো পাণ্ডবদের পরাস্ত করতে।

দ্রৌপদী। সে !—মা, -সে কি [চুপি চুপি যেন কত ভয়ে, কত আগ্রহে] সে কি মা, সে কি—

কুন্তী। হঁ্যা কর্ণ।

দ্রৌপদী। [যেন কত উৎফুল্ল হয়ে] কর্ণ ! হীন সূতপুত্র, কর্ণ ! কর্ণ !

[হঠাৎ ফিরলেন, মেঘ সরে গেল, চন্দ্রের পরিষ্কার আলো এসে পড়লো—কর্ণের সর্ব্বাঙ্গ ব্যেপে। দ্রৌপদী কর্ণকে দেখে বিস্ময়ে, ভয়ে, লজ্জায়, চীৎকার করে উঠলেন।]

—কর্ণ !

কর্ণ। হঁ্যা দেবী। স্বপ্নও নয়, ছায়াও নয়, বিভীষিকাও নয়,—পাণ্ডবদের সামান্য অতিথি কর্ণ।

দ্রৌপদী। [লজ্জা ও ক্ষোভের সঙ্গে] শঠ! প্রবঞ্চক! হীন-কুলোদ্ভব কাপুরুষ! কাল যুদ্ধে যদি কর্ণ বধ না হয়,—আমি চিতায় দেহ বিসর্জ্জন দেব। [দ্রুত চলে গেলেন, কুন্তী বিস্মিত]

কর্ণ। [নিঃশব্দে হেসে] এও কর্ণের জননীর মত একটী নারী, যে আত্মবিসর্জ্জন করে—তবু আত্মপ্রকাশ করে না!

কুন্তী। [কর্ণের দিকে ফিরে] বৎস!

কর্ণ। বৎস! তুমি আমার মা?

কুন্তী। বৎস!

কর্ণ। আবার! কর্ণের প্রতি কর্ণের-মায়ের সম্বোধন! কেন লুকিয়ে রেখেছিলে মা, তোমার ঐ একটি-মাত্র কথা? কেন স্তব্ধ করে রেখেছিলে আমার কণ্ঠ থেকে, আমার এই মাতৃ-সম্বোধন—মা? নারী, লোকলজ্জাকে তোমার এত ভয়?

কুন্তী। ভয়! তোমার জন্ম থেকে—আজ পর্য্যন্ত যতগুলি বৎসর, তার প্রত্যেকটি দিনের দুঃখ—আমি নীরবে সহ্য করেছি, একটুকুও কাতর হইনি, চঞ্চল হইনি, উন্মাদ হয়ে যাইনি বৎস! সে কি তোমার মায়ের দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ? [অগ্রসর হয়ে] তোমাকে তোমার জন্ম-পরিচয় নিয়ে, আমারই সম্মুখে উপহাস করেছে,—আমারই সম্মুখে লাঞ্ছিত হয়েছ তুমি! সহ্য করিনি আমি সে দুঃখ? তোমার শৌর্য্যে, তোমার কীর্ত্তিতে, পৃথিবী মুখরিত হয়ে উঠেছে! নীরব-শ্রোতার মত, শুনিনি আমি সে প্রশংসা তোমার? সন্তানের অহঙ্কারে মায়ের যে গর্ব্ব, গোপন করিনি আমি তা কর্ণ? বলো তবে, তোমার মা কি সত্যিই শক্তিহীনা?

কর্ণ। আর এক অপূর্ব্ব-ইতিহাস! [পরে রুদ্ধ-কণ্ঠে] কিন্তু মা, একদিন একটা শিশু, জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে—তোমার গর্ভে

আশ্রয় নিয়েছিল ; ছিল না তো তার কোনও অবিশ্বাস ! তারপর ভূমিষ্ঠ হতে না হতে, তাকে একটা তুচ্ছ তৃণের মত নদীগর্ভে ভাসিয়ে দিলে ; পরম বিশ্বাসে তো—ভেসেই চলেছিল সে ! কাতর-কণ্ঠের সেদিনের যত কান্না তার, সব তো সে—তোমাকে উদ্দেশ্য করেই কেঁদেছিল ! জেনেছিল সে কি তখন, কী-মৃত্যুর মুখে তাকে ফেলে দিয়েছিলে ? বলো মা, বলো, কেন তোমার সেই নিষ্ঠুর-অবহেলা, কেন এ নীরবতা, কেন সহ্য করেছ অজ্ঞাত-পরিচয় হয়ে—আমার এই নিয়ত-লাঞ্ছনা ?

কুন্তী। [গাঢ়কণ্ঠে অন্যদিকে চেয়ে] কুমারী জীবনের প্রথম প্রভাতে আমার,—তুমি প্রেমজ-সন্তান কর্ণ। মানুষ কি বুঝতো, কি গৌরবময় তোমার জন্ম-পরিচয় ?—পৃথিবী কি জানে কোনোদিন, প্রেমের সম্মান দিতে ? [কর্ণের দিকে ফিরে] বৎস, যে লাঞ্ছনাকে অতিক্রম করে, আজ তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ-সন্তান বলে সম্মান পেয়েছ ; কুমারীর সন্তান-পরিচয়ে, সে দুর্ভোগ তোমার শত-গুণ হয়ে দাঁড়াতো ! তাই ব্যর্থ-পরিচয়ের অভিশাপ থেকে বাঁচাতে, আমি তোমার পরিচয় চিহ্নটুকু মুছে নিছলাম ! [পুনরায় অন্যদিকে ফিরে] আর মৃত্যুর-মুখে আমি তো তোমাকে ফেলে দিইনি বৎস ! অক্ষয় কবচ-কুণ্ডল দিয়ে, তোমাকে আমি মৃত্যুঞ্জয়ী করেছিলাম। আমি তো জান্‌তাম, নদীর স্রোতে ভেসে—আমার সন্তানের মৃত্যু হবে না ! [কর্ণের নিকটবর্ত্তী হয়ে] বিসর্জ্জন তো দিইনি আমার সন্তানকে, আমি তাকে শুধু প্রবাসে পাঠিয়েছিলাম ! বলো, তোমার মা কি তবে স্বার্থপর ?

কর্ণ। [প্রায় সজল-চক্ষে] শেষ-রাত্রির শেষ ক্ষণটিতে তুমি নতুন কাহিনী শোনাচ্ছ, এ কি প্রহেলিকা নয় ?

কুন্তী। কর্ণ! মা আমি তোমার। ধ্যানময়ী-কুমারীর তপস্যার আগ্রহে, আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলাম। তোমার জন্মের সঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছিল কুন্তী। পৃথিবীর কাছে কি এমন আছে, যা কুন্তীকে প্রলুব্ধ কর্বে- কর্ণকে সন্তান বলে অস্বীকার করতে? আর লজ্জা? ভয়? তোমার মা কি নয়—যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুনের জননী? আমি কুন্তী! স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল জানে আমার পরিচয়! আমি কি কাউকে ভয় করি? গ্রহণ করিনি আমি গর্ভে, স্বামী-ছাড়া অন্য কারও সন্তান? প্রকাশ করিনি আমি, আমাকে? আমার একমাত্র রূপ? —আমার মাতৃত্ব?

কর্ণ। একি! বিশ্বের সমস্ত বিস্ময়—আজ শেষ-মুহূর্ত্তে আমার সম্মুখে! বলো তবে, নারী কি শুধু সৃষ্টি হয়েছে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করতে?

কুন্তী। মানুষকে দেবতা করতে নারীর একটিমাত্র রূপ, দেব-সন্তানের কল্পনাকে গর্ভে ধারণ করা! এ-রূপ নারীর একটি দিনে, হঠাৎ আসেনি কর্ণ! যুগের পর যুগের তপস্যা, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সংখ্যাতীত গর্ভ-ধারণ, বৎস্য, তবে জন্মেছে কুন্তী, তবে জন্মেছে—দেবোপম কর্ণ!

কর্ণ। দেবোপম কর্ণ! প্রতিনিয়ত এই লাঞ্ছনা, আর প্রতিনিয়ত এই দুঃখ। কেন? কেন এত আয়োজন? কেন এত তপস্যার সমারোহ? কি প্রয়োজন কর্ণের জন্মগ্রহণে?

কুন্তী। প্রয়োজন কর্ণের নয়! আর একটি নারীর প্রয়োজনে, জন্মগ্রহণ করেছে সে। একটা-নারীর ইচ্ছায়, তার দীর্ঘ তপস্যার ফলে, সে জন্মেছে আর একটা-নারীর ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে। কর্ণ! পুরুষ সন্তান, আর নারী মা; জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে অবস্থিত যে

অনন্ত-জীবন, সেই অফুরন্ত-জীবনের—ঐ একটাই অভিব্যক্তি। পুরুষ ও নারীর, শুধু ঐ একটাই পরিচয়।

কর্ণ। [বিস্মিত হয়ে] শুধু এই! তবে, আর কিছু তুমি নও! শুধু মা? বুঝি এতদিনে পেলাম আমার পরিচয়! আমি কর্ণ, দিগ্বিজয়ী মহাবীর;—এই প্রথম জানলাম, আমি শুধু মানবী-নারীর সন্তান! একি! বাঁচবার আগ্রহে—আমি কি নতুন করে জন্মগ্রহণ করছি !!!। [তখন প্রায় প্রভাত]

কুন্তী। [ব্যাকুলভাবে] রাত্রি প্রভাত হয়ে আস্‌ছে কর্ণ!

কর্ণ। [আর্ত্তকণ্ঠে] না—না, বড় শীঘ্র প্রভাত হয়ে আসছে এই রাত। মা, নিষেধ করো প্রভাতকে, রুদ্ধ করো সূর্য্যের-গতি, [পদতলে পড়ে] আমি শুধু দেখি ঐ অপরূপ মানবী-মূর্ত্তিতে মানুষের সর্ব্বসার্থকতা, নারীর গর্ভে তার স্নেহাভিষিক্ত অবস্থান, নারীর রক্তমাংসে তার দেহের জন্মক্রীড়া, নারীর ইচ্ছাধন্য হয়ে—তার জীবনের সর্ব্বসূচনা। কেন জাগেনি এতদিন আমার মনে—আমার এই মানবত্ব, এই আমার সত্যি-পরিচয়!

কুন্তী। [সাশ্রুনেত্রে] ওঠো কর্ণ! [উঠিয়ে চক্ষু মুছে] নারী তার সন্তানকে আনে—শুধু তার জীবনের সূচনা দিয়ে নয়, তার হৃদ্‌পিণ্ডের সঙ্গে মৃত্যুকে জড়িয়ে দিয়ে। সন্তানের সঙ্গে প্রসব করে, শুধু তার জন্মই নয়,—তার মৃত্যুও। কর্ণ! এই, আজ এই আমাদের বিদায়!

কর্ণ। [বাইরের দিকে চেয়ে] হ্যাঁ বিদায়! শেষ হয়ে গেল কর্ণ, শেষ হয়ে গেল তার—এই একসঙ্গে জন্ম আর মৃত্যু! [ফিরে] মা!

কুন্তী। [কর্ণের কাছে গিয়ে, সাশ্রু-নেত্রে] কর্ণ!

কর্ণ। এই নাও আমার শেষ-প্রণাম। [প্রণামান্তে] যুদ্ধ! হ্যাঁ, আজই,—এই আমার শেষ-যুদ্ধ।

[কর্ণ চলে গেলেন! কুন্তী যেন সহসা ভেঙে পড়লেন]

কুন্তী। [রুদ্ধ-কণ্ঠে] কর্ণ! কর্ণ!! কর্ণ!!!

[ততক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করেছেন নিঃশব্দে।]

ও, শ্রীকৃষ্ণ!

শ্রীকৃষ্ণ। এ কি! তোমার চোখে জল! আজ তবে, পূজার আয়োজন তোমার ব্যর্থ হয়ে গেল কুন্তী?

কুন্তী। যুদ্ধ? ধিক্! শুধু, যুদ্ধই যদি ঈশ্বরের সখ, অনন্তদিন ধরে শুধু চির-অসমাপ্ত একটা যুদ্ধের মধ্যেই, এই মহাসৃষ্টি তো চল্‌তে পারতো!

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষণকালের জন্যে বুঝি আত্মবিস্মৃত হয়েছ নারী! কোথায় রাত্রি -আর কোথায় তার অবসর! রাত্রি সব তো আছে ঘুমিয়ে, একটা অনন্ত দিনের মধ্যে! সেই একটি দিনেই তো ছুটে চলেছে, দুরন্ত-জীবনের আবেগে—গ্রহ-নক্ষত্র, কোটী-কোটী জীবাত্মা। বিপুল বিস্ময়কর সে গতিতে, প্রতি-নিয়ত ঘটছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কোটী-কোটী মহাপ্রলয়,- প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত-ভরা যুদ্ধের ইতিহাস। অবসর! কুন্তী! অর্জ্জুন-কর্ণ, আর ভীম-দুঃশাসনের যুদ্ধ আজ। ওরা -আমার জন্যে অপেক্ষা করছে—　　[প্রস্থান উদ্যত]

কুন্তী। [সাশ্রুনেত্রে বাধা দিয়ে] দাঁড়াও! আমি তোমাকে যেতে দেব না জনার্দন। যুদ্ধই যদি জীবনের অভিব্যক্তি, মৃত্যুর পথ আমি রুদ্ধ করবো। প্রলয়েই যদি সৃষ্টির অবস্থান, প্রলয় আমি ধ্বংস করবো। পৃথিবীর সমস্ত মাকে আমি আহ্বান জানাবো; সব মা এক হয়ে—শেষ করবো এই সন্তান-হত্যা—

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি কি উন্মাদিনী কুন্তী! এ যুদ্ধ, লীলা! ঈশ্বরের লীলা তুমি রুদ্ধ করবে?

কুন্তী। জানিনে ঈশ্বর, বুঝিনে লীলা! না, পারবে না কৃষ্ণ, তুমি পারবে না। আমি প্রকাশ করবো আমাকে, পাণ্ডবদের আদেশ করবো, কর্ণের পরিচয় চীৎকার করে শোনাবো কুরুক্ষেত্রে। কর্ণ! অর্জ্জুন!

[দ্রৌপদীর প্রবেশ]

দ্রৌপ। মা!

কুন্তী। [সচমকে] কৃষ্ণা!

দ্রৌপ। মন্দিরের ওপর থেকে লক্ষ্য করলাম মা, কুরুক্ষেত্রে একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত অগণিত যোদ্ধা, নিশ্চল হয়ে অবস্থান করছে।

শ্রীকৃষ্ণ। [সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষা করছে। যাও কৃষ্ণা! দেখে এসো, কর্ণের রথ যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছে কি না।

[দ্রৌপদীর প্রস্থান]

শান্ত হও কুন্তী! জীবনের গতি, রুদ্ধ করবার শক্তি তোমার নেই! একটা কুরুক্ষেত্র ব্যর্থ করে, তুমি শুধু লক্ষ কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি করবে। আর এ যুদ্ধে—কর্ণ, দুঃশাসন তো নিহত হয়েই জন্মগ্রহণ করেছে।

কুন্তী। একদিকে কর্ণ, আর একদিকে অর্জ্জুন! কর্ণ নিহত হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, আমার প্রথম সন্তান! আর তুমি বলছো, আমাকে শান্ত হতে! আমি মা নই?

শ্রীকৃষ্ণ। কে মা, আর কে সন্তান! কুন্তী তবে শোনো, সেই অপূর্ব্ব লীলা।—ছিল না নর, ছিল না নারী,—ছিল না রাত্রি কি দিন, গ্রহ-নক্ষত্র সূর্য্য কি চন্দ্র! ছিল অনন্ত দিবারাত্রহীন কাল, প্রবাহে কি

এক রহস্যময় মহানিদ্রা,আর সেই মহানিদ্রার মধ্যে রূপহীন, নামহীন, এক অসীম অবস্থিতি। কি? কার? কেন সে অবস্থিতি? এ প্রশ্নও ছিল না তখন! জন্ম নিল প্রথম সেই জিজ্ঞাসা,—কে? এক হল দুই, উত্তর এল 'নর ও নারী'। দুই হল বহু, 'মা ও সন্তান।' শেষ হল অশেষ। অশেষের অন্তর্ধান দেখা দিল এক অনন্তময় অসীমতায় অসংখ্য বিচিত্র রূপের মধ্যে। জন্মগ্রহণ করলো, রূপ, রস ও গন্ধ। [বিকর্ণের প্রবেশ] কি সংবাদ বিকর্ণ?

বিকর্ণ। অর্জ্জুন অপেক্ষা করছে জনার্দ্দন।

শ্রীকৃষ্ণ। রথে উপস্থিত হতে বলো;—আমি যাচ্ছি বিকর্ণ। [বিকর্ণের প্রস্থান] কুন্তী! এক মুহূর্ত্তের জন্যে—আমি তোমাকে দিব্যজ্ঞান দিচ্ছি, শোনো। একটি উত্তর এসে দৃষ্টিপাত করলো, একটি প্রশ্নের ওপর! এক অবিনশ্বর সৌন্দর্য্য এসে তার অনন্ত অসীম লাবণ্য দিয়ে আবৃত করলো সেই অশেষময় অবস্থিতির রূপ ব্যঞ্জনাকে। দুঃখ সৃষ্টি করে, আনন্দ করলো সুখ; ক্ষুধা উদ্রেক করে, খুসী হল অন্ন; ধর্ম্ম থেকে অধর্ম্ম বিচ্ছিন্ন করে, ধর্ম্ম দীক্ষা নিল সেই অধর্ম্মের কাছে; সত্য নিজের ছায়াটি প্রসারিত করে, সেই ছায়ারূপী মিথ্যাকে আলিঙ্গন করলো। যা হয় তাই হয়ে, যা নয়, তারই মধ্যে লীলা সুরু করলো—হয় ও নয়ের দ্বন্দ্বের এক প্রফুল্ল দর্শক—নামহীন, রূপহীন, আনন্দময় শিশু,—এই আমি। অর্জ্জুন, কর্ণ, তুমি, সবই সেই এক—এক আমি। [দ্রৌপদীর প্রবেশ]

কি দেখলে কৃষ্ণা?

দ্রৌপদী। হ্যাঁ! কর্ণের রথ বাসুদেব। বহু দূরে, যুদ্ধের একপ্রান্তে অপেক্ষা করছে।

শ্রীকৃষ্ণ। লক্ষ্য করেছ কৃষ্ণা, কে আজ কর্ণের সারথী?

দ্রৌপদী। মহারাজ শল্য,—যে কর্ণেব চিরশত্রু।

কুন্তী [আর্ত্তকণ্ঠে] শল্য!—এ যুদ্ধ তুমি বন্ধ করো, জনার্দ্দন! বলো, আমি স্বয়ং অর্জ্জুনকে আদেশ করি!

শ্রীকৃষ্ণ। চঞ্চল না হযে, যুদ্ধের ফলাফলের জন্যে—অপেক্ষা করো কুন্তী। যথা সমযে সংবাদ পাবে। মনে রেখো, লক্ষ কৌরব আজ পাণ্ডবেব শত্রু। [প্রস্থান]

কুন্তী। শুন্‌লে কৃষ্ণা, শ্রীকৃষ্ণ বলে গেলেন—যুদ্ধেব ফলাফলেব জন্যে অপেক্ষা কবতে। জানো কি এ যুদ্ধ? না, তুমি জানো না, জানো না কৃষ্ণা, কি এ যুদ্ধ!

দ্রৌপদী। না, আমি জানি মা। সেই অগণিত যোদ্ধাব, নিস্তব্ধ অবস্থিতি আমি দেখে এলাম। মনে হল, এ যুদ্ধ নয, এ প্রলয। দেখলাম আকাশেব পূর্ব্বদিকে, একপ্রান্ত থেকে আব এক প্রান্ত পর্য্যন্ত—রক্তবর্ণ সূর্য্যেব আলোকে বক্তিম হয়ে উঠেছে। আর—[হঠাৎ থামলেন। শঙ্খধ্বনি শুনলেন] ঐ শঙ্খধ্বনি। কৃষ্ণার্জ্জুনেব বথ—যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হল। [কুন্তী মুখ তুলে চাইলেন] কিম্বা হযতো সেই দুর্ম্মতি দুঃশাসনেব বথ—

কুন্তী। না, দ্রৌপদী, এ শঙ্খধ্বনি কর্ণের রথ থেকে।

দ্রৌপদী। ও, সেই হীন সূতপুত্র কর্ণের রথ। কুরুপাণ্ডবেব এই মহাসমর, তার কারণ ভাগ্যান্বেষী অভিশপ্ত ঐ কর্ণ!

কুন্তী। কর্ণই কুরুক্ষেত্রের কারণ, এ বিশ্বাস তোমার কেন হল পাঞ্চালী?

দ্রৌপদী। কেন জানিনে মা, তবু—অন্তর থেকে, অহরহ এই কথাই আমি শুনি। সেই লক্ষ্যভেদ সভা থেকে আবম্ভ করে—আজ পর্য্যন্ত যা কিছু ঘটেছে,—সব শুধু ঐ পরিচয়হীন, কাপুরুষ কর্ণকে লক্ষ্য করে।

কুন্তী। কাপুরুষ! কর্ণ! [দ্রৌপদীর দিকে অগ্রসর হয়ে] আমি জানি, কর্ণকে নিয়ে তোমাব অহরহ চিন্তা। কেন কৃষ্ণা ?

দ্রৌপদী। [চম্‌কে] মা! [পিছিয়ে গেলেন।]

কুন্তী। [অগ্রসর হয়ে] আমিও নারী, তুমিও নারী দ্রৌপদী। আমাকে সংকোচ করে, তোমার লাভ হবে না। কর্ণকে নিয়ে, তোমার এই অহরহ উদ্বেগ! কেন ?

দ্রৌপদী। [হঠাৎ পায়ের কাছে পড়ে] তবে একটা কথা তোমাকে নিবেদন করবো মা। এই দুর্দমনীয়-চিন্তার স্রোতে, আমি অসহায়ের মত ভেসে যাই। সেকি,-- সেকি কর্ণের পাণ্ডব-বিদ্বেষের জন্যে নয়!

কুন্তী। [দ্রৌপদীকে উঠিয়ে] পাণ্ডব-বিদ্বেষী যদি কর্ণ, তবে তার মত আরও অনেক তো রয়েছে দ্রৌপদী। কিন্তু আমি জানি, কর্ণের প্রতি সত্যিই, কোন বিদ্বেষ তোমার নেই।

দ্রৌপদী। [সচকিত হয়ে] নেই !!!

কুন্তী। না। আমি জানি কৃষ্ণা, কর্ণের বীরত্বে তুমি মুগ্ধ হও!

দ্রৌপদী। মুগ্ধ হই !!!

কুন্তী। হ্যাঁ! শুধু তার রহস্যময় জন্ম বলে, তার ওপর তোমার অভিমান। কৃষ্ণা, পরিচয়হীন হয়েও, কর্ণ কি পঞ্চপাণ্ডবেরও জ্যেষ্ঠ হবার যোগ্যতা দেখায়নি? তার ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, কি যুধিষ্ঠিরের চেয়ে কম? তার দেহ কি ভীমের মতই শক্তি রাখে না?—নয় কি সে অর্জ্জুনের মত উদার, বীর? দ্রৌপদী! আমি জানি, কর্ণের কথা শুনতে— তুমি সর্ব্বদা ব্যাকুল!

দ্রৌপদী। না না,—কিন্তু হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ব্যাকুল। কারণ পাণ্ডবদের অত বড় শত্রু আর নেই। তাই তাকে নিয়ে—এত দুশ্চিন্তা আমার। আমি তাকে ঘৃণা করি।

কুন্তী। তা করনা দ্রৌপদী। আমি নারী, আমার মনকে তুমি ভুল বুঝোতে পার না। কর্ণ পরিচয়-হীন না হযে, উচ্চবংশ-সম্ভূত হলে —পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী হতে তুমি।

দ্রৌপ। সুখী!—হ্যাঁ—নিশ্চযই সুখী হতাম। উচ্চবংশে জন্ম হলে, পাণ্ডবদের ওপব হীন-বিদ্বেষ তার সম্ভব হত না। হত না কুরুক্ষেত্রে —এই কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ।—কিন্তু মা,—সত্যি করে বলো, তুমি কি চাও, আমি কর্ণকে শ্রদ্ধা করি? মনে মনে তুমি কর্ণের প্রতি স্নেহশীল?

কুন্তী। [কম্পিত কণ্ঠে] তোমার মনের প্রশ্নটি এবার লুকোতে পারলে না কৃষ্ণা। কর্ণের প্রতি আমি স্নেহশীল,—এ বিশ্বাস তোমাব হয়েছে বলেই, কর্ণকে নিয়ে আলোচনা করতে- আজ আমাব কাছে ছুটে এসেছ। আমি জানি দ্রৌপদী, কর্ণকে তুমি একদিন মনে মনে অভিলাষ করেছিলে,—কর্ণকে তুমি ভালবাস।

দ্রৌপদী। মা!

কুন্তী। না, ক্ষুণ্ণ হযোনা দ্রৌপদী! মহৎকে ভালবাসা অপরাধ নয, —আমরা নারী।

দ্রৌপদী। মহৎ! কিন্তু কর্ণকে নিয়ে, তোমার এত চিন্তা কেন মা? কই,—ভীষ্মের যুদ্ধে তো দেখিনি তোমার এ চাঞ্চল্য। দ্রোণের যুদ্ধে? তখনও তো দেখিনি তোমার এত চিন্তা—? [অগ্রসর হয়ে] কর্ণের জন্যে, এত ভাবনা তোমার কেন মা?

কুন্তী। [চমকে] কেন? [একমুহূর্ত্ত পরে] দ্রৌপদী, কর্ণ যদি আর একজন পাণ্ডব হত!

দ্রৌপদী। [চমকে পিছিয়ে] একি অসম্ভব কথা!

কুন্তী। তবু এ অসম্ভব কথাটা—তোমারও মনে হয় কৃষ্ণা! আমি

জানি কৃষ্ণা, কর্ণকে তুমি কিছুতেই ভুল্‌তে পারছো না, তাই নিত্য তার মৃত্যু-প্রার্থনা করো।

দ্রৌপদী। তবে শোনো মা। আজ যুদ্ধে – হয় অর্জ্জুন নয় কর্ণ, একজনের মৃত্যু নিশ্চিত। তাই সব কথাই আমি তোমাকে বল্‌বো। [অগ্রসর হয়ে] আমরা নারী, পরস্পরের দুঃখ আমরা বুঝি মা! [হাত ধরলেন।]

কুন্তী। [হাত ছাড়িয়ে অন্যদিকে ফিরে] না, দুঃখ,—দুঃখ আমার নেই দ্রৌপদী।

দ্রৌপদী। [মুখ-তুলে চেয়ে] আছে। তুমি কর্ণকে স্নেহ করো। তোমার দুঃখ, কর্ণের জন্ম-পরিচয় গ্লানিশূন্য নয় বলে। আর আমার দুঃখ, পরিচয়-হীন বলে কেন এত তার ক্ষোভ! [অগ্রসর হয়ে] তোমার দুঃখ তুমি ভুল্‌তে পার না মা, কারণ পৃথিবীতে কর্ণ জীবিত হয়েও মৃত; আর আমার দুঃখ ভুল্‌তে পারি নে আমি, কারণ কর্ণ মৃত নয় – জীবন্ত! [এই সময় সহসা কোলাহল।]

দ্রৌপ। ও কি! যুদ্ধে কি কোনও মহাবীর নিহত হলো মা?

কুন্তী। নিহত হলো! [পুনরায় কোলাহল] দ্রৌপদী!

দ্রৌপ। একি! তুমি কাঁপছো! [কুন্তীকে ধরে] মা! কুন্তী! পাণ্ডব-জননী! তুমি কাঁপ্‌ছো কেন মা?

কুন্তী। [নিজেকে ছাড়িয়ে] পৃথিবী দুলে উঠ্‌ছে কৃষ্ণা!—কৃষ্ণ আমাকে সংবাদের জন্যে অপেক্ষা করতে বলেছে। ওঃ!—মনে হচ্ছে, আমি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি। দ্যাখো, দ্যাখো দ্রৌপদী, সূর্য্যের দিকে চেয়ে! সূর্য্যের আলো কি ম্লান হয়ে গেল!

দ্রৌপ। না। আকাশে কোথাও এতটুকু মেঘ নেই মা।

[বিকর্ণের প্রবেশ]

কি খবর বিকর্ণ ?

বিকর্ণ। আমি রথ এনেছি পাঞ্চালী, আপনাকে এই মুহূর্ত্তেই যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে। [কুন্তীকে] দুঃশাসনের মৃত্যু হয়েছে দেবী।

কুন্তী। ওঃ! দুঃশাসন! কিন্তু দ্রৌপদীকে কেন বিকর্ণ ?

বিকর্ণ। যুধিষ্ঠিব আদেশ করেছেন, দুঃশাসনেব বক্তস্পর্শ কবে দ্রৌপদী বেণী বাঁধ্‌বেন।

দ্রৌপদী। আব অর্জ্জুনেব সংবাদ বিকর্ণ ?

বিকর্ণ। তাব বথ এখনও কর্ণেব সম্মুখীন হয নি। [শঙ্খধ্বনি] এ অর্জ্জুন।

দ্রৌপদী। [আবাব শঙ্খধ্বনি শুনে] এ কর্ণ।

[ঠিক সেই সময একটা কোলাহল, আর যেন এক খণ্ড মেঘ এসে সূর্য্যকে আচ্ছাদন করলো। দৃশ্য সামান্য অন্ধকার।]

দ্রৌপদী। একি! সূর্য্যের জ্যোতি হঠাৎ ম্লান হযে যাচ্ছে মা।—

কুন্তী। হ্যাঁ, সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আস্‌ছে।

দ্রৌপদী। মা! তবে কি কর্ণ—

কুন্তী। [অধীর হযে বাধা দিযে] যাও, যাও তুমি দ্রৌপদী, তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে এসো! [দ্রৌপদী কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন বাধা দিযে কঠোর স্বরে] যাও!

দ্রৌপদী। চলো বিকর্ণ!—[বিকর্ণ সহ দ্রোপদী চলে গেলেন। দৃশ্য আরও অন্ধকার হয়ে গেল। বিহ্বল দৃষ্টি, বিস্ফারিত চক্ষু কুন্তী একাকিনী দাঁড়িযে, একবার এ দিকে, একবার ও দিকে চাইলেন। কয়েক সেকেণ্ড পরে, কয়েক মুহূর্ত্ত ব্যাপী ঝড়। ঝড়ে কুন্তীর বসন ও কেশ-পাশ উড়তে লাগলো। ঝড় থামলো। কুন্তীর

কেশ ও বেশ অবিন্যস্ত। সহসা ঘনঘন শঙ্খধ্বনি! এক মুহূর্ত্ত পরে, দূরে অস্ফুট রোদন-ধ্বনি। দৃশ্য আবও অন্ধকার। দুই দিকে দুই-পক্ষের যুদ্ধালাপ, দক্ষিণ থেকে পাণ্ডব-পক্ষেব ও বাম দিক থেকে কৌবব-পক্ষেব। প্রথমে ধীবে ও অস্ফুট কণ্ঠে, পরে দ্রুত ও উচ্চকণ্ঠে।]

শ্রীকৃষ্ণ। [দক্ষিণে] প্রস্তুত হও অর্জ্জুন। ঐ দ্যাখো, সম্মুখে কর্ণেব রথ।

কর্ণ। [বামে] মহাবাজ শল্য! ঐ দ্যাখো বথে কৃষ্ণার্জ্জুন। শত চেষ্টা কবেও যা পাবনি এতদিন,—আজ তাব সুযোগ পেযেছ শল্য। পাব যদি, কর্ণকে নিধন কবতে অর্জ্জুনকে সাহায্য কবে—তোমার শত্রুতায সাধ মিটিযে নাও।

অর্জ্জুন। জনার্দ্দন, আজ যুদ্ধে কর্ণ-বধ আমাব প্রতিজ্ঞা।

কুন্তী। [অস্ফুট কণ্ঠে] কর্ণ বধ! [হঠাৎ দক্ষিণে ছুটতে ছুটতে] না, থাক যুদ্ধ, যুদ্ধ থাক্ অর্জ্জুন- [কর্ণেব কণ্ঠস্বরে থাম্‌লেন।]

কর্ণ। নিজেব বথে মহাশত্রু শল্য। বিপক্ষেব রথে -মহাবথী অর্জ্জুন আব তাব সাবথী স্বযং বাসুদেব। এক সঙ্গে তিন-শত্রুব বিরুদ্ধে, কর্ণ আজ একা যুদ্ধ কববে।

কুন্তী। [আর্ত্তনাদ করে] না—না—কর্ণ! [বামদিকে ছুটতে ছুটতে] এ যুদ্ধ থাক্, থাক এ যুদ্ধ, কর্ণ! [অর্জ্জুনের কণ্ঠস্বর শুনে থাম্‌লেন]

অর্জ্জুন। জন্মপরিচযহীন সূতপুত্র। পৃথিবী থেকে, তোমার হীন নাম আমি মুছে দেব—

কর্ণ। কর্ণের জননি! কর্ণের বীরত্ব দেখতে নিস্পন্দ হয়ে অপেক্ষা করছে পৃথিবী! বলো, বলো মা, সম্মুখে ঐ উদ্ধত-বালক। কববো কি আমি একবার আমার কর্ণের যুদ্ধ?

কুন্তী। [আর্ত্ত কণ্ঠে] না—, তা হয় না, হয় না কর্ণ। অর্জ্জুন আমার কনিষ্ঠ সন্তান!

অর্জ্জুন। মা! তোমাকে প্রণাম করে, এই আমি অস্ত্র গ্রহণ করলাম, —আজ শেষ হোক্ কর্ণ—

কুন্তী। [ছুটে দক্ষিণে গিয়ে) না অর্জ্জুন,—না!—কর্ণ তোমার সহোদর—তোমার—

অর্জ্জুন। হীন রাধেয়। এই নাও, আমার প্রথম অস্ত্র!

কুন্তী। অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! ওঃ! [অস্ত্রের বজ্রাঘাত-তুল্য শব্দ ও দৃশ্যে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ খেলে গেল। আর্ত্তনাদ করে বসে পড়লেন কুন্তী। আবার ঝড়। ঝড় শেষে আবার—দাঁড়িয়ে কুন্তী, বিহ্বল-ভাবে চারিদিকে চাইলেন। বিভীষিকা আবার সুরু হল।]

কর্ণ। তোমার তীর আমার বাহুতে বিঁধেছে ধনঞ্জয়!—নাও সব্যসাচী—কর্ণের এই প্রথম অস্ত্র—

কুন্তী। [আর্ত্তনাদ] না—না কর্ণ! অর্জ্জুন তোমার কনিষ্ঠ,—তোমার ভাই,—তোমার—

অর্জ্জুন। কর্ণ! তোমার অস্ত্র যে তোমার হাত থেকেই পড়ে গেল! এই শক্তি তোমার!

কর্ণ। মহারাজ শল্য!—তোমার বিশ্বাসঘাতকতা অর্জ্জুনকে রক্ষা করলো। পারো,- এম্নি করে, সব অস্ত্র আমার ব্যর্থ করে দাও! চঞ্চল করে রাখো রথ।—একি! মহারাজ শল্য! আমার রথ মাটীতে বসে যাচ্ছে। একি তোমার রথ চালনা?

অর্জ্জুন। মেদিনী তোমার রথ গ্রাস করছে কর্ণ,—মৃত্যুর-গহ্বরে নিয়ে যাচ্ছে তোমাকে।

কর্ণ। কর্ণের জননী। আমার অন্তর থেকে অনুমতি দাও! বলো, শেষ মুহূর্ত্তে—একবার বলো মা। রথহীন হয়ে—এই মাটীর ওপর দাঁড়িয়েই, কৃষ্ণ-শুদ্ধ অর্জ্জুনকে নিশ্চিহ্ন করে দিই!

কুন্তী। [ছুটে বামে গিযে] না, আমি পারব না! থাক এ যুদ্ধ কর্ণ—তোমরা দুজনেই আমাব সন্তান।

কর্ণ। বলো মা, আমরা দুজনেই সন্তান। কিন্তু, একজন রথে আর এক-জন মাটীতে দাঁড়িযে। তবে? বলো! তুমি কি আমার মৃত্যু চাও?

কুন্তী। [আর্ত্তনাদ] কর্ণ! কর্ণ।—

অর্জ্জুন। হীন রাধেয—

কুন্তী। [ছুটে দক্ষিণে গিযে] অর্জ্জুন—

কর্ণ। আর বিলম্ব কোবো না ধনঞ্জয! হয শেষ আঘাত করো, নয—অবসর দাও, আমার রথ আমি ঠিক করে নিই—

অর্জ্জুন। জন্ম পরিচয়হীন সূতপুত্র! মৃত্যুব সময—চাও অবসর! এই নাও, তোমার মৃত্যুবান।

কুন্তী। অর্জ্জুন—অর্জ্জুন—[দক্ষিণে ছুটলেন]।

[নিদারুণ শব্দ ও তীব্র আলোক। শূন্যময হাহাকার। কুন্তী আর্ত্তনাদ করে দুহাতে মুখ ঢাকলেন।]

কর্ণ। ওঃ!—অপূর্ব্ব লক্ষ্য ধনঞ্জয়। ঠিক বুকেই বিঁধেছে তোমার তীর। মৃত্যুর সময মা—মা—

কুন্তী। কর্ণ—কর্ণ—কর্ণ—[বামে ছুটে—মূর্চ্ছিত হয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে আকাশ পরিষ্কার হযে গেল! সূর্য্যাস্ত। রক্তাম্বরা, বেণী-আলম্বিতা দ্রৌপদীর প্রবেশ]

দ্রৌপদী। মা, মা, অর্জ্জুন আর কর্ণের যুদ্ধ শেষ হল। [কুন্তীর কাছে এসে] মা, পাণ্ডবজননী, ওঠো মা, ওঠো। মা—মা—

কুন্তী। [ধীবে মুখ তুলে শূন্য-দৃষ্টিতে] আমি —আমি কি স্বপ্ন দেখছি !

দ্রৌপদী। না, না, না, ওঠো, এ স্বপ্ন নয় !

কুন্তী। [উঠে বিভ্রান্তভাবে] নয়। স্বপ্ন নয়। একি। আমাব কাব সঙ্গে কথা কইছি ! আমাব অদৃষ্টেব সঙ্গে ?

দ্রৌপদী। মিথ্যে কাতব হচ্ছ মা। কর্ণেব যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে, সূর্য্য অস্ত গিয়েছে মা।

কুন্তী। [চম্‌কে] অ্যাঁ, —অস্ত গিয়েছে সূর্য্য। তাই, তাই এত অন্ধকাব। হ্যাঁ, পেয়েছি, সংবাদ পেয়েছি আমি কৃষ্ণা।

দ্রৌপদী। [সাশ্রুনেত্রে] এ তোমাব কিসেব শোক মা, অর্জ্জুন জয়লাভ কবেছে ! আব সেই জন্ম-পবিচয়হীন সূতপুত্র—

কুন্তী। [দুহাতে কান ঢেকে] না—না, শুন্‌বো না। আব সহ্য কববো না—এ মিথ্যে তিবস্কাব। সে সে -আমার প্রথম সন্তান—

দ্রৌপদী। [সচমকে] সে। [স্তম্ভিত হয়ে] কে ? কে তোমাব সন্তান মা ? [নিদাকণ উদ্বেগে] বলো, চুপ কবে থেকো না মা।— সে কি—।

কুন্তী। হ্যাঁ—সে। দ্রৌপদী। সেই-

দ্রৌপদী। কর্ণ ?

কুন্তী। কর্ণ। [দুহাতে মুখ ঢাকলেন।]

দ্রৌপদী। [আর্ত্তনাদ] কর্ণ !

কুন্তী। [দ্রৌপদীব হাত ধবে] তিবস্কাব করবে কৃষ্ণা ?—কর্ণ আমাব প্রথম সন্তান—

দ্রৌপদী। আর কর্ণ আমাব প্রথম স্বপ্ন ! —স্বর্গের সেই প্রথম সূচনা, তুমি আমায় ব্যর্থ করেছ।

কুন্তী। [ব্যথায় চঞ্চল হয়ে] না—অবিচার করিনি আমি কৃষ্ণা।

এক কর্ণের পরিবর্ত্তে, আমি তোমাকে পঞ্চ-পাণ্ডবের স্ত্রী করেছি। [হাত ধরে] আর, কর্ণের-মা আমি! আমার কি আছে কৃষ্ণা?

দ্রৌপদী। [ধীরে হাত ছাড়িয়ে] পারলাম না, ক্ষমা করতে পারলাম না তোমাকে!—পাণ্ডব-জননী! আমার এ কুরুক্ষেত্র, তুমি সৃষ্টি করেছ!

[শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ—সব-শেষে যুধিষ্ঠির]

অর্জ্জুন। মা!—

কুন্তী। অর্জ্জুন!—[ছুটে গিয়ে অর্জ্জুনকে নির্ভর করে ভগ্নকণ্ঠে] জয়ী হয়েছ অর্জ্জুন? তুমি জয়ী হয়েছ? [কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।]

অর্জ্জুন। [নিজেকে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে] জন্ম-পরিচয়হীন বলে—কতবার বিদ্রূপ করেছি তাকে, কতবার শুনেছ তুমি তা। তবু—কেন দাওনি তার পরিচয়?—আজ এই হাত দিয়ে তার বুকে তীর বিঁধেছি—

কুন্তী। [দুঃসহ-ব্যথায়] না, আর প্রশ্ন কোরো না ধনঞ্জয়! তোমার সে তীর, তোমার তূণে আমি তুলে দিয়েছিলাম বৎস!—কুন্তীর জীবনের, প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তের—নিঃশব্দ-ব্যথা দিয়ে তৈরী সে তীর! আমি—আমি—[হঠাৎ থেমে] দ্রৌপদী, তুমি কাঁদছো?

দ্রৌপদী। [চক্ষু মুছে] না মা!—না!

কুন্তী। [অর্জ্জুনকে] সব্যসাচী! তোমার চোখে জল?

অর্জ্জুন। [সাশ্রুনেত্রে] আমাকে মার্জ্জনা করো মা!

কুন্তী। কাঁদছো,—সবাই!—কিন্তু,—আমি? আমি কি শুধু দেবী হয়েই জন্মেছি!

শ্রীকৃষ্ণ। দাও কুন্তী, তোমার সব-যন্ত্রণা আমাকে দাও! আমি বোধ হয় পাষাণ ছিলাম, মানুষ হয়ে জন্মেছি;—আজ—আবার পাষাণ

হয়ে যাই! বলো, কর্ণের-মৃত্যুর জন্যে—মানুষ-তোমরা কেউ দায়ী নও!—দায়ী শুধু—পাষাণ-দেহী এই শ্রীকৃষ্ণ!

কুন্তী। এ কি! বাসুদেব! তুমি! তোমার,—তোমারও চোখে জল! না, আমি কাঁদ্‌বো না, তবু কাঁদবো না আমি!—[যুধিষ্ঠিরকে] যুধিষ্ঠির! এসো! বুকের-রক্ত দিয়ে আমি তোমাকে জয়ী করেছি,—আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবো! এসো! না,—আমি কুন্তী!—আমি দেবী! [শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সকরুণ-ভাবে] কৃষ্ণ!—কৃষ্ণ! [সহসা চোখ দিয়ে অশ্রুর-বন্যা নেমে এল] না জনার্দ্দন! আমি দেবী নই! মানুষ-মা আমি,—আমি কর্ণের মা!

যুধিষ্ঠির। [মাতৃচরণে নত হয়ে সাশ্রুনেত্রে] হ্যাঁ,—মানুষের মা তুমি!—আশীর্ব্বাদ করো মা! কর্ণের মৃত্যুর সঙ্গে,—পৃথিবীর সব দ্বন্দ্ব এবার শেষ হয়ে যাক্!

[শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে সাশ্রুনেত্রে চেয়ে আছেন কোন এক মহাশূন্যের দিকে। ব্যথার সে কি এক পরম-প্রকাশ!]

—যবনিকা—

গান

(১)

(১ম অঙ্কে, প্রথমে সভাকবির কণ্ঠে)

রচনা—শ্রীশৈলেন রায়। স্থর—শ্রীপরেশ ধর।

হে অতীত, শোনাও অমৃত তব বাণী।
স্মরণের পথে পথে, জ্বালো, জ্বালো,
প্রসন্ন প্রদীপখানি।
কালের দিগন্ত লোকে,—
দূরে বহুদূরে ;—
হারানো দিনের ব্যথা
ঝুরে, আজো ঝুরে।
সুদূরের সীমানা ছাড়ায়ে,
তারে কাছে আনো টানি।
হে ভারতী,
কোন শ্লোকে করেছিল দ্বৈপায়ন
তোমার আরতি!
আজ যে শোনা যায় অমৃত-ঝঙ্কার,
গাণ্ডীবের গম্ভীর প্রচণ্ড টঙ্কার।—
কৃষ্ণরাতে কৃষ্ণার চোখ—
জ্বলিবে বিদ্যুৎ হানি।

(২)

(১ম অঙ্কে, নিদ্রার পূর্বে কৃষ্ণার কণ্ঠে)

ভেসে যাই স্বপ্ন তন্দ্রালোকে,
ছলনার লীলা ভরা—
আঁধারে আলোকে।
বসিয়া কালের পারে,
কে যেন মধুর জীবন-ছন্দে,
দোলা দেয় বারে বারে।
কে যেন প্রদীপ রেখেছে জ্বালিয়া,
পুলক-বেদন-শোকে।

(৩)

(৩য় অঙ্কে, কর্ণের সহিত সাক্ষাতের পূর্বে কৃষ্ণার কণ্ঠে)

অনন্তরূপে অনন্তে বিরাজো,
বিরাজো হৃদয়-মন্দিরে।
তোমাব লীলার অসীম আনন্দ,
জীবন-শতদলে বন্দিরে !
মোর ভাবনার ত্রিভুবনে,
জেগে আছ তুমি ক্ষণে ক্ষণে,
তুমি আছ মোর উছল হাসিতে,
বেদনা-বিষাদ-গম্ভীরে।
আশা নিরাশায় সুখে দুখে,
তোমারি মূরতি জাগে বুকে,
সুন্দর তুমি, তুমি ভয়ংকর,—
সংগ্রাম তুমি, সন্ধিরে।
